ঐতিহাসিক উপন্যাস।

(টডস্-রাজস্থানের ছায়াবলম্বনে)

শ্রীকিশোরী মোহন রায় প্রণীত।

"There is not a petty state in Rajasthan that has not had its Tharmopylea, and scarcely a city that has not produced its Leonidas."
TOD.

"আপরিতোষাদ্বিদুষাং নসাধুমন্যে প্রয়োগবিজ্ঞানম্ ।"
কালিদাস।

কলিকাতা,

আর্য্য-যন্ত্র।

১২৯৮।

বিনীত নিবেদন।

হাম্বির উপন্যাস প্রকাশিত হইল। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর সহিত ইহার অধিকাংশের সম্বন্ধ, কিন্তু ইহা কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থবিশেষের অনুবাদ নহে। আমি কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে ভারতের অমূল্য-রত্ন 'রাজস্থান' পাঠ করিতেছিলাম; যে সকল স্বদেশ-প্রেমিক বীরগণের অপূর্ব্ব জীবনী পাঠ করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছি, বীরবর হাম্বিরের জীবনী তাহাদিগের মধ্যে অন্যতম। মিবারের রাণা প্রতাপসিংহ প্রভৃতির মহনীয় কীর্ত্তিকলাপ, বঙ্গের অনেক সুসন্তান কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় লিখিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, রাজস্থানের সংক্ষিপ্তসার ব্যতীত বঙ্গভাষায় হাম্বিরের জীবনী স্বতন্ত্র প্রকাশিত হয় নাই। আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি—আমার ক্ষুদ্র জীবনের প্রথম উদ্যমে বীরবর হাম্বিরের পুণ্য-পূত নাম স্মরণ করিয়া উপন্যাসাকারে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশ করিলাম। বীরচরিত হাম্বিরের অপূর্ব্ব জীবনী পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি যে অকৃত্রিম ভক্তি ও কৃতজ্ঞতার উদ্রেক হইয়াছিল, এ ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সেই উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতার ফল। হাম্বিরের ন্যায় স্বদেশ-প্রেমিক

বীরবরের মহনীয় জীবনী আমা হইতে সুসম্পন্ন হইল না, ইহা আমি বুঝিতে পারি। আশা করি, কোন একজন গুণগ্রাহী বঙ্গীয় সন্তান, হামিরের অপূর্ব্ব জীবনী প্রকাশিত করিয়া স্বর্গবাসী দেবগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইবেন।

গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-সমাজের যশোভাজন হইব, এ আশা দিনেকের জন্যও আমি করি নাই। পুস্তকখানি বীরবর হামিরের পবিত্র পদাম্বুজে অঞ্জলি-পুষ্পমাত্র। দরিদ্রের উদ্যানে ভিক্টোরিয়া গোলাপ ফুটিবে কি প্রকারে? সুতরাং দরিদ্রের উদ্যানজাত সামান্য গাঁদাফুলই অর্পণ করিলাম। ভরসা করি, সহৃদয় স্বদেশবাসিগণ দেব-অঞ্জলি বলিয়াও ইহাকে একটীবার স্পর্শ করিবেন। ছিদ্রান্বেষী নিন্দুকের নিন্দায় আমি ভয় করি না। অন্ততঃ কবির এ মনোহর কবিতা স্মরণ করিয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারিব, যথাঃ—

"স্নিগ্ধ করে সাধুজনে সাধুবাদ দিয়া।
অধম নিন্দুকে নিন্দা কর'য়ে কেবল ॥"

কলিকাতা,
ভাদ্র, ১২৯৮। } গ্রন্থকারস্য।

পরিচয়।

এই নবীন লেখক আমার এক জন প্রিয় শিষ্য। নবীন বয়সে তিনি যেরূপ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে আমার দৃঢ়বিশ্বাস, কালে ইনি একজন সুলেখক হইবেন। "হামীর" ইঁহার রচনাশক্তির প্রথম বিস্ফুরণ। বীরবর, স্বদেশানুরাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হামীরের জীবনী পাঠ করিলে পাষাণ-হৃদয় ব্যক্তিরও হৃদয় গলিত হইবে। সেই অমূল্য জীবনী নবন্যাসের আকারে অপূর্ব্বশোভা ধারণ করিয়াছে। হামীর-মহিষী ক্ষেত্রকুমারীর অদ্ভুত পতিভক্তি ও হামীরের প্রগাঢ় দেশ-ভক্তি একত্র মিশ্রিত হওয়ায় যেন সোণায় সোহাগা যোগ হইয়াছে। এই দুই দেবভাবের সংমিশ্রণের ফল চিতোর-উদ্ধার। অধীন জাতির পক্ষে এরূপ উপদেশপূর্ণ জীবনী অতি বিরল। যতদিন আমাদের দেশের রমণীগণ স্বদেশ-হিতৈষণা-বৃত্তির অনুশীলনের অনুকূল না হইতেছেন, ততদিন আমাদের জাতীয় সঞ্জীবনের আশা নাই। সুতরাং হামীরজীবনী আমাদের দেশের স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই বিশেষ শিক্ষাস্থল। পুস্তকের মূল্য যেরূপ অল্প, তাহাতে ইহা ক্রয় করিতেও কাহারও কোন কষ্ট হইবে না। সুতরাং আশা করি, সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রই এই নবীন লেখকের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ।

স্বাধীনতার লীলাভূমি চিতোরের সুখ-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। দুরন্ত কালোপম আলাউদ্দীন চিতোরের প্রতি ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া পাপ দুরভিসন্ধি সাধনের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছে। দুর্ব্বৃত্তের অভিলাষ কেবল মাত্র রাজ্যলাভ নহে— সঙ্গে সঙ্গে অলোক-সামান্যা সুন্দরী পদ্মিনীর অপ-রূপ রূপ তাহার হৃদয়ে অনুক্ষণ জ্বলিতেছিল। স্বচ্ছ দর্পণে রমণীরত্ন পদ্মিনীর অপরূপ রূপ দেখিয়া দুরাচার যবন উন্মত্তপ্রায় হইয়াছে। কৌশলে কার্য্য সিদ্ধি হইল না দেখিয়া আলাউদ্দীন তাহার সমগ্র শক্তি চিতোরের প্রতি নিপাতিত করিতে উদ্যত।

বীর-প্রসবিনী চিতোর নিশ্চিন্ত নহে। রাজ্যের সর্দ্দার, সেনানী ও বীরগণ জননী জন্মভূমিকে যবন-গ্রাস হইতে রক্ষা করিতে অগ্রসর। দুরন্ত আলা-উদ্দীন নিকটে—চিতোরের বীরগণ আর বিলম্ব করা সঙ্গত বোধ করিলেন না। অবিলম্বে চিতোর-বীরগণের সম্মিলনে, তাঁহাদিগের মুহুর্মুহু জয়-নিনাদে চতুর্দ্দিক্ কম্পিত করিয়া তুলিল। কিন্তু ইহাতেই আশঙ্কা মিটে কৈ? তাঁহারা সকল কণ্টক বিনাশ করিয়া রণরঙ্গে অবতীর্ণ হইবেন। চিতোরের অসূর্য্যম্পশ্যা রমণীগণ কোথায় যাইবেন? অবশেষে কি তাঁহাদের পবিত্র গাত্রে যবনের কলুষিত হস্ত পতিত হইবে? না,—তাহা হইবে না! অবিলম্বে চিতা সজ্জিত হইল—চিতোরের সতী, সাধ্বী বীর-নারীগণ একে একে জ্বলন্ত চিতায় আত্মসমর্পণ করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে আলাউদ্দীনের পৈশাচিক স্পৃহা এই খানেই মিটিয়া গেল। চিতোর-বীর-গণের আর আশা ভরসা কিছুই রহিল না।

অবিলম্বে রাণা লক্ষণসিংহ, বীরগণের সহিত, যবন-যুদ্ধে অমানুষিক বীরত্বাভিনয় দেখাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন।

রাণা লক্ষণসিংহের পরলোক-গমনের পর তাঁহার একমাত্র বংশধর, পুত্র অজয়সিংহ জীবিত ছিলেন। চিতোর যখন যবনকরায়ত্ত, পিতৃপুরুষের লীলানিকেতন জননী জন্মভূমি যৎকালে বিজাতীয় আক্রোশে নিষ্পেষিত, তখন অজয়সিংহ, কৈলবারায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। স্বদেশ-প্রেমিক অজয়সিংহ, শৈলময় কৈলবারার নির্জ্জন বাসে নানা চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। চিতোরচিন্তার বিষ-দংশনে অজয়সিংহ সর্ব্বদা অস্থির ছিলেন। যে চিতোর কিয়ৎকাল পূর্ব্বেও স্বাধীনতার লীলা-নিকেতন এবং বীরগণের আবাসস্থল ছিল, যেখানে তিনি পিতামাতার স্নেহময় ক্রোড়ে লালিত ও পালিত হইয়াছেন, যেখানে তিনি জননীর স্তন্য-পানের সঙ্গে সঙ্গে বীরগাথা শ্রবণ করিয়া পুলকিত

হইতেন, আজ জননী জন্মভূমি সেই চিতোর বিজাতীয় শত্রুর করতলে! এ চিন্তা অজয়সিংহের স্বদেশভক্ত প্রাণকে ক্ষতবিক্ষত করিত। তাঁহার হৃদয় যেন শত-বৃশ্চিক্-দংশনের যাতনা অনুভব করিত। কোন কোন সময় তিনি ভয়ানক উত্তেজিত হইতেন; কোষোম্মুক্ত তরবারিহস্তে উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ছুটিতেন; পরক্ষণেই জ্ঞানের সঞ্চার হইত; নিষ্ফল চেষ্টা বুঝিতে পারিয়া আবার নিজেই লজ্জিত হইতেন। যাহা হউক অজয়সিংহ উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত সন্তান ছিলেন। কৈলবারার শৈলময় স্থানে বসিয়া জন্মভূমির উদ্ধার-পন্থা দেখিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রাণা লক্ষ্মণসিংহ, যৎকালে জননী জন্মভূমির জন্য যবনযুদ্ধে নিহত হইলেন, তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে পুত্র অজয়সিংহকে বলিয়া গিয়াছিলেন, অরিসিংহের পুত্র হামির চিতোরের সিংহাসন রক্ষা করিবে। অরিসিংহ রাণা লক্ষ্মণের জ্যেষ্ঠ পুত্র,—অজয়সিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। দূরদর্শী প্রাচীন রাণা যে কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই সত্য হইল।

দুর্ব্বৃত্ত আলাউদ্দীন চিতোরনগরে প্রবেশ করিল। দেখিল, চিতোর শ্মশানে পরিণত। স্বদেশ-বৎসল বীরগণ চিতোরকে ভস্মস্তূপে পরিণত

করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। চিতোরের যে শোভা-সৌন্দর্য্য আলাউদ্দীনের পাপ-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, তাহার সকলই ভস্মস্তূপে পরিণত। যে লাবণ্যলতিকার অতুলনীয় ললিত-লাবণ্য দুরাচার যবনের কলুষিত হৃদয়কে উন্মত্তপ্রায় করিয়াছিল, আজ তাহার পরমাণু মৃত্তিকায় মিশিয়া গিয়াছে—সে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য ভস্মে পরিণত হইয়াছে। চিতোর আজ মহাশ্মশান। আলাউদ্দীন উন্মত্তের ন্যায় পদ্মিনীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত। পদ্মিনী আর নাই,—যবন-স্পর্শ-ভয়ে ভীতা, সতী সাধ্বী পদ্মিনী আজ চিতোরের অযুত নরনারীর সহিত অশেষ জ্বালাযন্ত্রণাময় পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া অমরলোকে গমন করিয়াছেন। আলাউদ্দীন নিরাশ হইল। চিতোরের প্রতি তাহার আক্রোশ যেন শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। আলাউদ্দীন তাহার অগণিত সৈন্যসহিত তাহারই অনুগত মালদেব নামক একজন সামন্তকে চিতোর-শাসনের ভারার্পণ

করিয়া চিতোর পরিত্যাগ করিল। চিতোরের অবশিষ্ট হতভাগ্য প্রকৃতিপুঞ্জ অধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ থাকিয়া যেন চিরকাল অশেষ নির্যাতন সহ্য করিতেই জীবিত রহিল।

অজয়সিংহ তাঁহার পিতৃকথিত শেষ বাক্যটী ভুলিতে পারেন নাই। ভ্রাতুষ্পুত্র হামির তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরুক ছিল। অজয়সিংহ হামিরকে তাঁহার নিকটে রাখিতে ইচ্ছা করিলেন। বালক হামির সে সময় মাতুলালয়ে ছিল, অবিলম্বে অজয়ের নিকট আনীত হইল। তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি অজয়-সিংহ বালকের আকৃতি দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন, তাহার ঐ ক্ষুদ্র শরীর তেজস্বিতার প্রতিমূর্ত্তি। বালকের উদার প্রশান্ত বদনে যেন অটল দৃঢ় প্রতিজ্ঞার মূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। নিরীহ কৃষক-পরিবারে পালিত দ্বাদশ-বর্ষীয় বালক যেন মুহূর্ত্তে তাহার পিতৃব্যের আদেশ-পালনে অগ্রসর। অজয়-সিংহ পুলকিত হইলেন—আশার একটি ক্ষীণ-রশ্মি-

রেখা অনেক দিন পরে তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইল। চিতোরের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল এই বালকটীকে পাইয়া অজয়সিংহ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। চতুর্দ্দিকে শত্রু-বেষ্টিত হইয়া, মুষ্টিমেয় সৈন্যবলের উপর নির্ভর করিয়া অজয়-সিংহ কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন—প্রাণপণে হামিরকে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত করিতে লাগিলেন।

অজয়সিংহ কৈলবারার শৈলসঙ্কুল প্রদেশে বাস করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি নিরাপদ ছিলেন না। অবিলম্বে তাঁহার এক ভীষণ প্রতি-দ্বন্দ্বী উপস্থিত হইল। দূরবিস্তৃত কৈলবারায় পার্ব্বত্য ভীলগণের বাস। অজয়সিংহের প্রভুত্ব তাহাদিগের সহ্য হইত না। বলৈচা সর্দ্দার তাহা-দিগের রাজা। এক দিন বলৈচা, তরবারী, ভল্ল প্রভৃতি অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত হইয়া অজয়সিংহের আবাসস্থলে উপস্থিত হইয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রার্থনা করিল। বলৈচা অদ্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, অজয়-

সিংহের বাহুবল পরীক্ষা করিয়া তবে গৃহে ফিরিবে। অবিলম্বে অজয় তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন; ভীল-সর্দ্দার ও রাজপুত্র আজ পরস্পরকে বাহুবল দেখাইবার নিমিত্ত অগ্রসর। আজ কাহার বাহু কত শক্তি ধারণ করে, এই দ্বন্দ্বক্ষেত্রে তাহার পরীক্ষা হইবে। অজয়সিংহের প্রধান সেনানীগণ বর্ত্তমান থাকিতে তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রথমে অগ্রসর হইতে তাহারা নিষেধ করিল, কিন্তু দুরন্ত ভীল-সর্দ্দার তাহা শুনিলনা,—অজয়সিংহের শক্তি পরীক্ষা করিতেই সে আসিয়াছে। দ্বাদশবর্ষীয় বালক হামির তরবারি-হস্তে অগ্রসর হইল,—ভীলসর্দ্দার বলৈচার দিকে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ প্রার্থনা করিল। ভীল-সর্দ্দার অবজ্ঞার উচ্চ হাসিতে বালকের প্রস্তাব উড়াইয়া দিল। ক্ষোভে, রোষে হামিরের চক্ষু হইতে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। অতি বেগে তরবারী আস্ফা-লন করিয়া ভীল-সর্দ্দারের অহঙ্কারের প্রতিফল

দিতে হামির অগ্রসর হইতেছিলেন,—গুরুতর অনিষ্টাশঙ্কা করিয়া অজয়সিংহ আসিয়া অতিকষ্টে তাঁহাকে নিবৃত্ত করিলেন। অবশেষে ভীলসর্দ্দার বলৈচার দিকে অগ্রসর হইয়া তাহাকে সম্বোধন-পূর্ব্বক অজয়সিংহ বলিলেন,—"বলৈচা! প্রস্তুত হও, স্বয়ং আমি তোমার যুদ্ধ-পিপাসা মিটাইব, রাজপুত মরিতে ভয় করেনা।" অমনি বলৈচার বিশাল হস্ত তাহার বিশাল ভল্ল উত্তোলন করিল। দুই জনই ভল্ল-চালনায় সুদক্ষ—দুই জনই অসুর-বলে বলীয়ান্। চতুর্দ্দিক্ উভয়পক্ষের দর্শক-মণ্ডলীতে পরিপূর্ণ। মুহূর্ত্ত-মধ্যে উভয়ে ভীষণ আকার ধারণ করিলেন—ক্ষণকালের জন্য উভয়েই অতি অপূর্ব্ব কৌশলে আত্ম-রক্ষা করিতে লাগি-লেন। কিন্তু পরক্ষণেই অজয়সিংহ অতি আশ্চর্য্য কৌশলে বলৈচার মস্তকে অতি বেগে ভল্ল প্রহার করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ শব্দে ভীলসর্দ্দারের দেহ ভূতলে লুণ্ঠিত হইল।

বহু যত্নে ভীলগণ তাহাদিগের সর্দ্দারের চৈতন্য সম্পাদন করিল। বলৈচা সর্দ্দার পরাজিত হইয়া ক্ষোভে, রোষে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেল। সেই হইতে অজয়সিংহের প্রতি তাহার জাতক্রোধ সঞ্চারিত হইয়াছে। যে কোন উপায়ে ভীলগণ, অজয়সিংহের প্রাণবিনাশের চেষ্টায় রহিয়াছে। এইরূপে অজয়সিংহ চতুর্দ্দিকে শত্রু-পরিবেষ্টিত হইয়া কৈলবারা পর্ব্বতের শিরোদেশে আপন শক্তি-সঞ্চারে প্রবৃত্ত রহিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

যে দিন বালক হামির অজয়সিংহের বাস-ভবনের সম্মুখে ভীল-সর্দ্দার বলৈচার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে অগ্রসর হইয়াছিল; কিন্তু বালক বলিয়া সে তাহা অগ্রাহ্য করে, সে দিনের কথা হামির ভুলিতে পারে নাই। হামির সে দিন আপনাকে যেরূপ অবমানিত মনে করিয়াছিল, জীবনে আর কোন দিন তাহার সেরূপ হয় নাই। যদিও পূজ্যপাদ পিতৃব্যের আজ্ঞা শিরোধারণ করিয়া হামির সে ভীষণ ব্যাপার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে হামিরের হৃদয়ে যে বিজাতীয় আক্রোশ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা

অস্ত্রে নির্ব্বাণ হইল না, ভীল-সর্দ্দারের মুণ্ডপাত করিয়া তাহা নির্ব্বাপিত হইল।

অজয়সিংহ ভীলজাতির দৌরাত্ম্যে ব্যতিব্যস্ত হইতেছিলেন। প্রতিক্ষণে তাঁহার জীবনের আশঙ্কা হইতেছিল। অসভ্য ভীলগণ কখনও লুক্কায়িত থাকিয়া তাঁহার সৈন্যদিগকে অতর্কিত আক্রমণ করিত, কখনও বা অতি সাবধানে অজয়সিংহের অন্বেষণ করিত। অজয় অনতিবিলম্বে তাহাদিগের প্রশ্রয়ের উপযুক্ত শাস্তি দিতে বাসনা করিলেন। তিনি অনেক দিন ভীলদিগের অসভ্যোচিত ব্যবহার সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু আর পারিলেন না। অজয়সিংহ উপস্থিত কার্য্যে হামিরকেই নিয়োগ করিতে সংকল্প করিলেন। ইতিপূর্ব্বে যদিও তিনি তাহার তেজস্বিতার পরিচয় পাইয়াছেন, তথাপি এই বার তিনি হামিরকে পরীক্ষা-ক্ষেত্রে পাঠাইলেন। ভ্রাতুষ্পুত্ত্রকে ডাকাইয়া লইয়া যখন অজয়সিংহ তাঁহার সংকল্পের কথা জানাইলেন, বালক হামিরের

বদনে তখন এক অলৌকিক তেজের আবির্ভাব হইল। আজ চিরশত্রু বলৈচার আচরণের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান করিবে ভাবিয়া হামির উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিল। অবিলম্বে কতিপয় সৈন্য-সমভিব্যাহারে হামির তাহার দুরন্ত শত্রু বলৈচার বিরুদ্ধে যাত্রা করিল। যাইবার সময় পিতৃব্য অজয়কে বলিয়া গেল,—"যদি বলৈচার মস্তক আপনাকে উপহার না দিতে পারি, তবে আর ফিরিয়া আসিবনা।" অবিলম্বে হামির, দুর্গম শৈল-সঙ্কুল পথ অতিক্রম করিয়া ভীলদিগকে আক্রমণ করিল। হামির যদিও বয়সে বালক, কিন্তু তাহার সে প্রচণ্ড বিক্রমের সম্মুখে ভীলগণ অধিকক্ষণ টিঁকিলনা; অতি অল্প কালের মধ্যে কৈলবারার শৈলবাসিগণ বিস্ময়-বিস্ফারিত-নয়নে চাহিয়া দেখিল, হামির অশ্বারূঢ় হইয়া ভল্লাগ্রভাগে কাহার মস্তক বিদ্ধ করিয়া লইয়া আসিতেছে। হামির, অজয়সিংহের বাসভবনের সিংহদ্বারে

আসিয়া একবার বিকট গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহার সৈন্যগণ কৈলবারার শৈলভূমি কাঁপাইয়া হামিরের বিজয় ঘোষণা করিল।

অজয়সিংহ অবিলম্বে সে স্থলে উপস্থিত হইলেন। হামির তৎক্ষণাৎ বলৈচার রক্তাক্ত মস্তক লইয়া পিতৃব্যের চরণে উপহার দিয়া প্রণাম করিল। অজয়সিংহ আনন্দে অধীর হইলেন। তিনি সে উচ্ছ্বসিত আনন্দাবেগ ধারণ করিতে পারিলেন না—দুই বাহু তুলিয়া হামিরকে আলিঙ্গন করিলেন। তৎক্ষণাৎ বলৈচার ছিন্ন মস্তকের রুধিরধারা হইতে শোণিত লইয়া হামিরের ললাটে অঙ্কিত করিয়া দিলেন। সেই মুহূর্ত্তে অজয়সিংহ হামিরের ললাটে যাহা অঙ্কিত করিয়া দিলেন, তাহা আর কেহই মোচন করিতে পারিল না। পিতৃব্য-প্রসাদ সেই শোণিত-চিহ্ন কালে রাজ-তিলকে পরিণত হইল। আজ অজয়সিংহ তাঁহার পিতার শেষ বাক্য স্মরণ করিলেন। পিতার সে ভবিষ্যৎ-

বাক্যের সত্যতা উপলব্ধি করিলেন, এবং উপলব্ধি করিয়া হৃদয়ে যথেষ্ঠ শান্তি পাইলেন। আজ যদি রাণা লক্ষণ সিংহের একমাত্র পুত্র অজয়সিংহের অভাব হয়, তাঁহার স্থান অধিকার করিতে আর এক জন বর্ত্তমান আছে—পিতৃপুরুষের গৌরব সম্ভ্রম রক্ষা করিতে আর একজন বর্ত্তমান থাকিবে, ইহা ভাবিয়াও অজয়সিংহ অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

উপরোক্ত ঘটনার পর কয়েক বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। অজয়সিংহ, ভ্রাতুষ্পুত্রের ললাটে রাজতিলক অঙ্কিত করিয়া দিয়া হঠাৎ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মিবারের সিংহাসনে হামির অভিষিক্ত হইলেন,—সমগ্র মিবারবাসী হামিরের বশ্যতা স্বীকার করিল।

সিংহাসনারোহণের অব্যবহিত পরে, সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে হামির "টেকাডোরে" চলি-লেন। হামিরের পিতৃপুরুষানুক্রমে "টেকাডোর" নামক বীরপ্রথা প্রচলিত। যে কোন নবীন রাজা সিংহাসন-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই সৈন্য সামন্ত লইয়া কোন শত্রুরাজ্য আক্রমণ করেন, ইহারই

নাম “টেকাডোর”। ত্রয়োদশবর্ষ বয়সে তিনি যে ভীল-সর্দ্দার বলৈচার মস্তক পিতৃব্য অজয়-সিংহকে উপহার দিয়াছিলেন, আজ টেকাডোর-উপলক্ষে তাহারই রাজ্য আক্রমণে চলিলেন। বলৈচা সর্দ্দারের মৃত্যুর পর আর এক জন তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে; পার্ব্বত্য ভীলগণ ক্রমে অধিকতর বল-সঞ্চয় করিয়াছে। হামির অনতি-কাল-মধ্যে ভীলদুর্গ “পশোলিও” আক্রমণ করি-লেন। হামির সহস্রাধিক সৈন্য লইয়া পশোলিও দুর্গ আক্রমণ করিলেন। ভীলদিগের সহিত তুল-নায় তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা নিতান্ত সামান্য ছিল। হামির গোপনে আক্রমণ করেন নাই; সুতরাং অতি অল্প কালের মধ্যেই ভীলগণ তাঁহার আগমন-বার্ত্তা জানিতে পাইল। অবিলম্বে তাহারা যথোপ-যুক্ত স্থানে প্রস্তুত রহিল। সমুদায় পার্ব্বত্যজাতি একত্রিত হইয়াছে—উৎসুকনয়নে সকলেই হামি-রের আগমন অপেক্ষা করিতেছে।

হামির পেশোলা দুর্গের নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন। সম্মুখেই একটী গিরিক্ষুণ্ণ পথ। চতুর্দ্দিক পর্ব্বতমালা বেষ্টন করিয়াছে—মধ্যে অপ্রশস্ত একটী পথ দ্বারা ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়; ঠিক্ সেই স্থলে নীরবে মিবার-বাহিনী আসিয়া দাঁড়াইল। সেই শৈল-সঙ্কুল প্রদেশ নিস্তব্ধ—তাহার অতিদূর পর্য্যন্ত মনুষ্যবসতি আছে তাহা জানিবার উপায় নাই। ঊষাসূর্য্যের হেমাভ রশ্মি পর্ব্বতগাত্রে পতিত হইয়া যেন পার্ব্বত্য প্রদেশের স্বাভাবিক গম্ভীর ও ম্রিয়মাণ প্রকৃতিতে সজীবতার সঞ্চার করিতেছে। পার্ব্বত্য প্রকৃতির স্বাভাবিক নিস্তব্ধতার পরিবর্ত্তে আজ যেন শৈল প্রদেশ আরও অধিকতর নিস্তব্ধতা ধারণ করিয়াছে। প্রবল ঝটিকা উঠিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে, তরঙ্গিনী যেমন স্থিরপ্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে—প্রবল প্রকৃতি-বিপর্য্যয়ের অব্যবহিত প্রাক্কালে যেমন প্রকৃতির মৃদু বাক্যালাপ সম্পূর্ণ থামিয়া গিয়া প্রকৃতি এক ধীর প্রশান্ত পরিচ্ছদ

ধারণ করে, আজ যেন ভীল পাহাড় সেই আকার ধারণ করিয়াছে। শৈলপ্রকৃতির মৃদুমধুর বাক্যালাপ আর শোনা যায় না। ঊষাকালীন বিহঙ্গকুলের সে শ্রবণ-সুখকর সঙ্গীতধ্বনি, ঊষার মৃদু মধুর সমীরণ-হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইয়া আজ আর স্বভাবসুন্দরী ভীলরমণীদিগকে আকুলিত করে না। সত্যই যেন মুহূর্ত্ত-মধ্যে কি এক প্রবল ঝটিকার আবির্ভাব হইয়া শৈলপ্রদেশ রসাতলে দিবে—অবিলম্বে ভীষণ অশান্তি উত্থাপিত হইয়া প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দিবে। সেই জন্যই আজ যেন পার্ব্বত্য প্রদেশ এত ধীর, ও গম্ভীর।

মিবারবাহিনী যে গিরিক্ষুণ্ণ পথের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, সেই স্থান, আক্রমণকারীর কিঞ্চিৎকাল বিবেচনার স্থল। হামির আজ স্বয়ং সেনাপতি। নিকটে ভীলগণ উপস্থিত কি না জানিবার জন্য তূর্য্যনাদ করিলেন। হামিরের গম্ভীর তূর্য্যনিনাদ নির্ঝর-নিস্তব্ধ প্রকৃতিকে আলোড়িত করিয়া,

নিকটবর্ত্তী, লুক্কায়িত ভীলগণকে অতিক্রম করিয়া সুদূর উচ্চ পেশোলা দুর্গকে জাগাইয়া দিল। অদূর-বর্ত্তী ভীলগণ বুঝিল, হামির নিকটে। হামিরের সন্দেহ দূর হইল না—অবিলম্বে কামান দাগিতে আদেশ দিলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যে হামিরের বজ্রনাদী কামান পর্ব্বত-গাত্র কাঁপাইয়া তুলিয়া, অসংখ্য জীবজন্তুর সভয় রোল তুলিয়া দিয়া পেশোলা দুর্গের আমূল কাঁপাইয়া দিল। কামানের বজ্রনাদী শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ভীলগণের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু সে কম্প অধিক কাল স্থায়ী হইল না—কারণ তাহারাও বীর। ভীলগণ, হামিরের বারম্বার আহ্বানের একবারও উত্তর দিল না। চতুর হামির ভীল-গণের চতুরালী বুঝিলেন। হামির বুঝিলেন, ভীল-গণ মনে করিয়াছে, মিবার-সৈন্য নিশ্চিন্তে, অসতর্ক অবস্থায় প্রবেশমাত্র আক্রমণ করিবে। হামির ক্ষণকালের জন্য চিন্তা করিলেন,—বুঝিলেন, পর্ব্ব-তের অপর পার্শ্বেই গিরিপ্রবেশের প্রবেশ দ্বারেই

ভীলগণ নিঃশব্দে তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে। সন্দেহস্থলে অধিকতর দৃঢ়তার নিমিত্ত তৎক্ষণাৎ কয়েকজন অশ্বারোহীকে সেই প্রবেশমুখে যাইতে আজ্ঞা দিলেন। তীব্র বেগে কয়জন অশ্বারোহী চলিল। কিছুকাল পরেই চারিজন অশ্বারোহী ফিরিয়া আসিল, অগ্রগামী দুই জন আর ফিরিল না। অপ্রশস্ত কূট পন্থার প্রবেশ-দ্বারে সহস্র ভীল-সৈন্যের তীক্ষ্ণ অস্ত্রের উন্মত্ত আঘাতে হামিরের অশ্বারোহী সৈন্যদ্বয় চিরকালের জন্য সেই খানেই থাকিয়া গেল, আর ফিরিয়া আসিতে হইল না। হামির সকলই বুঝিলেন। ধূর্ত্ত ভীলগণের চাতুরীর উপরে হামির আরও চতুরালী খেলিতে প্রয়াস পাইলেন; তৎক্ষণাৎ কতিপয় সৈন্যকে পার্শ্ববর্ত্তী শৈলপ্রাকারে উঠিতে আদেশ করিলেন। আজ্ঞামাত্র দুই জন, চারিজন করিয়া অতি সামান্য-মাত্র অবলম্বনের সাহায্যে উপরে উঠিল। যখন কয়েকজন উঠিল, তখন একের সাহায্যে আর

একটী, আর একটীর সাহায্যে আর একটী অতি আশ্চর্য্য কৌশলে পর্ব্বতচূড়ায় উঠিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে হামিরের সুশিক্ষিত সৈন্যগণের মধ্যে প্রায় সহস্র সৈন্য পর্ব্বতচূড়ায় যাইয়া দাঁড়াইল। একটী মাত্র শব্দ নাই, কাহারও মুখে বাক্যব্যয় নাই—নীরবে সকল কার্য্য শেষ হইল। গিরিক্ষুণ্ণ পথের মুখে তখন শতাধিক মাত্র অশ্বারোহী সৈন্য অবশিষ্ট রহিয়াছে। তখন সেই অবশিষ্ট সৈন্য-দিগকে যাহা করিতে হইবে, উপদেশ দিয়া হামির মুহূর্ত্তমধ্যে পর্ব্বতোপরি সৈন্যদিগের নিক্ষিপ্ত রজ্জুর সাহায্যে পর্ব্বতচূড়ায় যাইয়া দাঁড়াইলেন। দেখি-লেন, তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য পর্ব্বতচূড়ায় উঠি-য়াছে ; অল্প-সংখ্যক, নীচে, ক্ষুদ্র পথমুখে দাঁড়াইয়া আছে। হামির একবার পেশোলা দুর্গের দিকে তাকাইলেন—দেখিলেন, পেশোলা দুর্গের সমুন্নত মস্তক আকাশ ভেদ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে— দুর্গের চূড়ায়, গাত্রে কতিপয়মাত্র ভীলসৈন্যের

অস্পষ্ট আকৃতি প্রতীয়মান হইতেছে। হামির বুঝিলেন, দুর্গাভ্যন্তরে অতি সামান্য-সংখ্যক ভীল রহিয়াছে। এদিকে পার্শ্ববর্ত্তী তলদেশে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, অগণিত ভীল-সৈন্য, বন্যাপ্রবা-হের ন্যায় সেই গিরিক্ষুণ্ণ পথের মুখে একত্রিত হইয়াছে। সেই অগণ্য ভীলগণের হস্তপদসঞ্চা-লনাদি সুন্দররূপে দেখা যাইতেছিল, কিন্তু কাহা-রও মুখে শব্দ ছিল না। ভীলরাজ্যের আবাল-বৃদ্ধ-যুবা সেই গিরিপথমুখে দাঁড়াইয়া মিবার-অনীকিনীর প্রতীক্ষা করিতেছিল। হামির ভীল-গণের প্রতি আশ্চর্য্য চাতুরী খেলিয়াছেন ভাবিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। সেই সময় হামির তাঁহার পরিত্যক্ত, নীম্নস্থ, দণ্ডায়মান সৈন্যদিগকে কি একটী সঙ্কেত করিলেন। অমনি তাহারা ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনায়, শতাধিকমাত্র সৈন্যের মুহুর্মুহু হুঙ্কারে সে স্থানে এক ভীষণ-ব্যাপার উপস্থিত হইল। হামির ভীল-

গণের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, তাহারা তখনও নীরব—কিন্তু সহস্র সহস্র ভীল সেই সুড়ঙ্গমুখে অগ্রসর হইতেছে। সেই মুহূর্ত্তে হামির, ইষ্ট-দেবতাকে স্মরণ করিলেন—পরক্ষণেই সৈন্য-গণকে নীচে পেশোলা দুর্গের দিকে অগ্রসর হইতে আদেশ দিলেন। আদেশমাত্র সৈন্যপ্রবাহ নীরবে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভীলগণ ইহা দেখিলেও দেখিতে পাইত, কিন্তু তাহারা সেই সুড়ঙ্গমুখেই ব্যতিব্যস্ত। আর এক মুহূর্ত্ত—তাহা-হইলেই হামির, সমভূমিতে দাঁড়াইতে পারেন, এমন সময় সুড়ঙ্গমুখে তাঁহার অপর পার্শ্ববর্ত্তী সৈন্যগণের অতিশয় কোলাহল শুনিতে পাইলেন। সেই মুহূর্ত্তে হামির এক বিকট গর্জ্জন করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে সহস্র মিবারবীর গর্জ্জন করিয়া উঠিল। সে প্রবল গর্জ্জন শূন্যে মিশিয়া গেল না—শত বজ্রনিনাদের ন্যায় তাহা অদূরবর্ত্তী ভীলগণের কর্ণে যাইয়া লাগিল। আকস্মিক এ ব্যাপারে তাহারা

উন্মত্তপ্রায় হইল। সবিস্ময়ে তাহারা চাহিয়া দেখিল, বহুতর মিবারসৈন্য অদূরে অগ্রসর হইতেছে। তখন ভীলগণ তাহাদিগের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গর্জ্জন করিল। অসংখ্য অসভ্য ভীলগণের সে অসংখ্য কণ্ঠ হইতে যে বিকট গর্জ্জন উঠিল, তাহাতে কঠিন পর্ব্বতগাত্র কাঁপাইয়া দিল, শিশু ও রমণীদিগের আর্ত্তনাদ উঠাইল, মিবারসৈন্যদিগকে আরও অধিকতর উৎসাহিত করিয়া তুলিল। সে ভীলপ্রবাহের গতি তখন ফিরিয়া গেল—অসংখ্য ভীল, অর্দ্ধ উলঙ্গপ্রায় হইয়া অস্ত্র উত্তোলন করিয়া মিবার-সৈন্যের দিকে ছুটিল। হামির নিজের তুলনা করিলেন—দেখিলেন, সংখ্যার তুলনায় তাঁহার সৈন্যসংখ্যা মুষ্টিমেয়। বন্যার প্রবাহের ন্যায় সে ভীলপ্রবাহে তাঁহার সে মুষ্টিমেয় সৈন্য কতক্ষণ টিকিবে? কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার বীরগণের বীরত্বের কথা স্মরণ করিলেন—সে সিংহবিক্রম মনে পড়িয়া হৃদয়ে অসীম বল পাইলেন।

মিবার-বাহিনী সে ভীলপ্রবাহকে অগ্রাহ্য করিয়া অগ্রসর হইতেছিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই ভীলগণ ভীষণ তেজে মিবার-সৈন্যের উপর পতিত হইল। দুই দলেরই সম্মুখে গতি, সুতরাং এক ভীষণ সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। কেহ কাহাকেও টলাইতে পারিল না,—অবশেষে সেই স্থলে পেশোলা দুর্গের পাদ-দেশে, হামির-সৈন্যে ও ভীলগণে এক বিষম রণা-ভিনয় হইতে লাগিল। ভীলসৈন্য ও মিবারসৈন্য, পরস্পরকে ক্ষুধিত শার্দ্দূলের ন্যায় আক্রমণ করিতে লাগিল। এদিকে সহসা বিপদ্ দেখিয়া ভীলগণ পূর্ব্বে সেই সঙ্কীর্ণ পথমূলে যে একত্রিত হইয়াছিল, তাহা ত্যাগ করিয়া হামিরের দিকে অগ্রসর হইল; তখন হামিরের পরিত্যক্ত সেই শতাধিক অশ্বারোহী অতি সহজে সে পথ অতিক্রম করিয়া পেশোলার পাদদেশে সেই ভয়াবহ রণক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়া-ইল। তাহারা চাহিয়া দেখিল, ভীলগণ ক্রমাগতঃ অগ্রসর হইয়া যুদ্ধ করিতেছে, পশ্চাতে তাহাদের

দৃষ্টি নাই। তৎক্ষণাৎ সে সৈন্যদল প্রচণ্ড হুঙ্কারের সহিত সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় ভীলপ্রবাহের পশ্চাদ্দেশ আক্রমণ করিল। সে শতাধিকমাত্র সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্যের ভীষণ তরবারীর আঘাতে মুহূর্ত্তে শত শত ভীল পতিত হইল। তাহাদের সে আশ্চর্য্য কৌশলের সম্মুখে ভীলগণের চেষ্টা কার্য্যকরী হইল না। সম্মুখে সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য মরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিতেছে, এদিকে পশ্চাদ্দেশও আক্রান্ত হইয়াছে; দুই দিকে আক্রান্ত হইয়া ভীলগণ বিপদ্ গণিল। ক্রমে তাহাদের বলক্ষয় হইয়া আসিল। মুহূর্ত্তে মিবারসৈন্যের ভীষণ অস্ত্রাঘাতে সহস্র ভীল মরিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা পার্শ্বে হটিয়া গেল—হামিরের অপূর্ব্ব অস্ত্র-চালনায় বাত্যাহত কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভীলগণ পড়িতে লাগিল। কিছুকালের মধ্যে হামিরের সৈন্যদল সম্পূর্ণ জয়লাভ করিল। কিছুকাল পূর্ব্বের সে নিস্তব্ধ প্রকৃতি

এখন ভয়াবহ আকার ধারণ করিয়াছে। সৈন্য-গণের আস্ফালনে, বিকট চীৎকারে, মুমূর্ষুর কাত-রোক্তি, আঘাতিতের যন্ত্রণায় রণস্থল এক মহা-শ্মশানে পরিণত। হামিরের প্রচণ্ড তরবারীর সম্মুখ হইতে অতি অল্প-সংখ্যক ভীল প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিয়াছিল।

হামির তৎক্ষণাৎ দুর্গদ্বারে উপনীত হইলেন। সামান্য চেষ্টায় দুর্গদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। হামির তাঁহার সমগ্র সৈন্যগণ-সমভিব্যাহারে পেশোলা দুর্গ অধিকার করিলেন। আজ মিবারের রাজপতাকা পেশোলা দুর্গে উড্ডীন হইল—কৈলবাঙ্গার সমগ্র প্রদেশ হামিরের বশ্যতা স্বীকার করিল। সিংহাসন-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই নবীন যুবকবীর তাঁহার নবীন জীবনের প্রথম অধ্যায়ে এইরূপে দুর্জ্জয় পেশোলা দুর্গে স্বীয় বিজয় নিশান গাড়িয়া দিলেন।
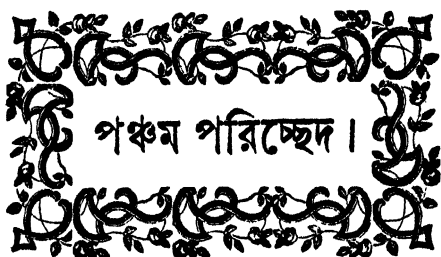
পেশোলা দুর্গ অধিকৃত হইয়াছে। ভীল-জনপদ দুরন্ত হামিরের প্রবল তরবারীর সম্মুখে সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে। সমগ্র শৈলপ্রদেশ হামিরের করায়ত্ত্ব হইয়া তাঁহার বিজয় ঘোষণা করিতেছে।

হামির সিংহাসনারোহণ করিয়া পেশোলা দুর্গ অধিকার করিলেন। যে কৈলবারার নিস্তব্ধ প্রদেশের একটী সামান্য বাস-বাটিকায় অজয়সিংহ আসিয়া নিরীহের ন্যায় বাস করিতেছিলেন, বীরবর হামিরের কৌশলে, কালে তাহাই শোভা-সৌন্দর্য্যময়ী নগরীতে পরিণত হইল। যে কৈলবারা-

শৈল কেবলমাত্র অসভ্য বর্ব্বরজাতি ও শ্বাপদ পশ্বাদি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, তাহাই কালে অসংখ্য নরনারীতে পরিপূরিত হইল। মিবার-রাজবংশের ভবিষ্যপুরুষ বীরবর প্রতাপসিংহ যে পবিত্র ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়া জগতের বীরেন্দ্র-মণ্ডলীর প্রণম্য হইয়াছেন, সেই মিবারের স্থাপয়িতা বীরবর হামির।

হামির নানা উপায়ে মোগল সৈন্যদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। যে চিতোর তাঁহার পিতৃপুরুষগণের লীলা-নিকেতন, তাঁহার পিতা, পিতামহ জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অকাতরে হৃদয়ের শোণিত পাত করিয়া যে স্থানের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন, আজ কিনা তাহাই ম্লেচ্ছ যবনের অধিকৃত! যে চিতোরের প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার পিতৃপুরুষগণের রাজত্বে রামরাজ্যে বাস করিত, আজ কিনা তাঁহাদের বংশধর বর্ত্তমানেও তাহারা যবনের কঠোর নির্যাতনে নিষ্পেষিত।

যে চিতোর-মহিলাকুলের সতীত্ব-সরোজের সুমধুর সুবাস সমগ্র চিতোরভূমিকে অশেষ পাপ তাপ হইতে দূরে রাখিত, আজ তাহাই—সমগ্র হিন্দু-সন্তানের শ্লাঘনীয়, চিতোরের হৃদয়রত্ন রমণীকুল পাপ যবনের পাপস্পর্শে সঙ্কুচিতা—কলুষিতা। এ চিন্তাও হামিরের প্রাণকে সর্ব্বদা ক্ষত বিক্ষত করিত! মুহূর্ত্তের জন্য হামির চিতোরকে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই—মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার প্রাণ শান্তভাবে থাকে নাই। চিতোর-চিন্তার বিষ-[illegible] হামির সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিতেন।

[illegible]রেই হামির একটী উপায় স্থির করিলেন। মোগল সৈন্য-দল চিতোরের বহির্দ্দেশে পার্ব্বত্য-প্রদেশের মধ্যে সদা সর্ব্বদা ভ্রমণ করিত, হামির সেই বিজন পার্ব্বত্য প্রদেশের অতি দুষ্প্রবেশ্য স্থানে আপন সৈন্যদল লইয়া লুক্কায়িত থাকিতেন। দলবদ্ধ মোগল সৈন্য যখন সেই স্থানসকলের নিকটবর্ত্তী হইত, অতি অতর্কিতভাবে ভীষণ-বিক্রমে

হামির-সৈন্য সেই সকল মোগল-সেনার উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিত। মোগলসেনাদল সহসা সে আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারিত না। বহুসংখ্যক প্রাণ হারাইত—অতি অল্পই প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিত। ক্রমে মোগল-সৈন্য সতর্ক হইল; তাহারা তখন বহু-সংখ্যক দলবদ্ধ হইয়া বহির্গত হইত। কিন্তু হামি-রের সে অপূর্ব্ব কৌশলের নিকট তাহাদের সকল চেষ্টা বৃথা হইত। বহু অনুসন্ধানে হামিরের সে গুপ্ত সৈন্যাবাস তাহারা খুঁজিয়া পাইত না। এই-রূপে কিছুকালের মধ্যে মোগল-সৈন্যের অধিকাংশ ক্ষয়িত হইয়া গেল।

বীরবর হামির এই প্রকারে তাঁহার শত্রুকুল ধ্বংস করিতে লাগিলেন। মোগলের সহস্র চেষ্ট হামিরের সে অসীম কৌশল-জাল ছিন্ন করিতে পারিল না। দিনের পর দিন অতীত হইতে লাগিল, ক্রমাগত হামির-সৈন্যের অতর্কিত আক্রমণে মোগল-

কুল ক্ষয়িত হইতে লাগিল। হিন্দু প্রজাবর্গের সে সঙ্কটসঙ্কুল সময়ে—চিতোরের সে অধঃপতন-কালে—ম্লেচ্ছ যবনের অধিকারকালে যখন হিন্দুর জাতিধর্ম্ম—কুলললনার কুলধর্ম্ম সকলই রসাতলে যাইবার উপক্রম করিতেছিল, তৎকালে হামির, মোগলকুল-ধ্বংসের নিমিত্ত যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তদ্ব্যতীত অন্য কোন উপায় ছিল না। স্বর্গাদপি উচ্চ জন্মভূমি ম্লেচ্ছ যবনের পাপ-স্পর্শে কলুষিতা, চিতোরের সতী সীমন্তিনীগণ দুরাচারদিগের পাপস্পর্শ-ভয়ে সর্ব্বদা সঙ্কুচিতা; এ চিন্তা হামিরের হৃদয়কে ব্যাকুল করিয়া তুলিত। দুরাচার যবনদিগকে উপযুক্ত প্রতিফল দিতে, চিতোরকে পাপকলুষ-নিগড় হইতে মুক্ত করিতে হামির ন্যায় অন্যায় বিবেচনার সময় পাইতেন না। যে কোন উপায়ে যবন-বিনাশ তাঁহার উদ্দেশ্য। যে অন্যের প্রাণের সামগ্রী অন্যায়পূর্ব্বক অধিকার করিয়াছে, অন্যের স্বাধীনতায় অন্যায়পূর্ব্বক হস্তা-

র্পণ করিয়াছে, পবিত্র ললনাকুলে অনপনেয় কলঙ্ক-কালিমা প্রক্ষেপ করিয়াছে, তাহাদিগের প্রাণে চিরকালের জন্য বিষম শেল বিদ্ধ করিয়া জগতে পৈশাচিক অভিনয়ের জ্বলন্ত দৃশ্য দেখাইতে পারিয়াছে, হামির তাহাদিগের প্রতি ন্যায় অন্যায় বুঝিতেন না। ছলে, বলে, কৌশলে যবন-বধ তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

সঙ্কীর্ণ-গিরিপথ। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতোপরি ঘন নিবিড় বনরাজী পার্ব্বত্য প্রদেশকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। হামির অতি সাবধানে মোগলসেনাগণের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। অবিলম্বে অদূরে অশ্বখুর-শব্দ শ্রুত হইল। হামির সে পার্ব্বত্যপ্রদেশে রাজবেশ পরিধান করিতেন না, সামান্য সৈনিকের বেশে পর্য্যটন করিতেন। অশ্বপদশব্দ শুনিবামাত্র হামির তৎক্ষণাৎ তাঁহার পরিধেয় বেশ পরিত্যাগ করিলেন। সেই মুহূর্ত্তেই সামান্য একখানি বস্ত্রমাত্র পরিধানে রাখিয়া তিনি

মোগলসেনানীগণের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। হামির যৎকালে অশ্বখুরশব্দ শুনিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ বৃক্ষান্তরালে লুক্কাইত হইতেছিলেন, তখন মোগল-গণ তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছিল; কিন্তু তিনি যখন বৃক্ষান্তরালে ঘন নিবিড় অরণ্যে প্রবেশ করিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে বেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, মোগলগণ তাহা দেখিতে পায় নাই। নিমেষের মধ্যে হামির সম্পূর্ণ বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া যখন মোগলসেনানীগণের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, তখন তিনিই যে লুক্কায়িত সৈনিক পুরুষ, ইহা তাহারা বুঝিতে পারিল না। হামিরকে তাহারা সামান্য পথিক বিবেচনা করিয়া সেই পথে একজন সৈনিক-বেশধারী ব্যক্তিকে দেখিয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিল। চতুর হামির তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন,—"আমি দেখিয়াছি, এইমাত্র একজন সৈনিক ঐ বনের ভিতর লুকাইল।" মোগল-সেনানীগণ বলিল,—"তুমি আমাদিগকে সে স্থান

দেখাইতে পার ?” হামির তখন যেন ভীত হইয়া বলিলেন,—“যদি আমাকে দেখিতে পায়, তবে মারিয়া ফেলিবে।” মোগলসেনানীগণ তখন তরবারী দেখাইয়া আশ্বস্ত হইতে কহিল। হামির তখন যেন বড়ই আশ্বস্ত হইলেন, বলিলেন,—“আমি তোমাদিগকে সেখানে লইয়া যাইতে পারি, কিন্তু সেখানে বড় সাবধানে যাইতে হইবে। তোমাদের ঘোড়া বন্দুক সব রাখিয়া যাইতে হইবে, যাহাতে কোন গোল না হয়। সাবধানে না যাইলে যদি তাহারা দেখিতে পায় ?” মোগলসেনানীগণ এ কথায় যেন একটু চিন্তিত হইল, কিন্তু পরক্ষণেই পথিকের কথায় সম্মত হইল। চতুরের চাতুরী বুঝিল না—ঘোড়া, বন্দুক সব রাখিয়া তাঁহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল।

নিঃশব্দে—অতি সাবধানে মোগলগণ হামিরের পশ্চাৎ চলিতে লাগিল;—ক্রমেই গভীর বনের মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিল। চতুর্দ্দিকে

সমুন্নত পর্ব্বত; মধ্যে সংকীর্ণ একটী অন্ধকারময় পথে চলিতে লাগিল। ক্রমেই যখন তাহারা গভীর হইতে গভীরতম অন্ধকারময় স্থানে প্রবেশ করিল, তখন তাহাদের মনে হঠাৎ সন্দেহ উপস্থিত হইল। মোগলসেনানীগণ তৎক্ষণাৎ অগ্রগামী পথিককে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল। কোথায় আর সে পথিক? তাহারা উত্তর পাইল না। বিনা সাহায্যে মোগলসৈন্যের সাধ্য কি, সে অন্ধকারময় পার্ব্বত্য পথ চিনিয়া লয়? পুনরায় যেমন সেই পথিককে তাহারা তীব্রস্বরে ডাকিয়াছে, অমনি চতুর্দ্দিক্ হইতে ভীষণ হুঙ্কাররবে বহুতর অস্ত্রধারী সৈন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিল। মোগলগণ এতক্ষণে পথিকের চাতুরী বুঝিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিল। কিন্তু সেই অন্ধকারময় পার্ব্বত্যপ্রদেশের অভ্যন্তরে, অনভ্যস্ত মোগলসৈন্যদল দলিত ও নিষ্পেষিত হইয়া গেল। একটী প্রাণীও হামিরের সে প্রচণ্ড তরবারীর সম্মুখে নিস্তার পাইল না।

সেই দিন, মোগলসৈন্যদল চিতোর-দুর্গ হইতে যে একবার নির্গত হইয়াছিল, হামির তাহাদিগকে পুনরায় আর সে চিতোরে যাইতে দিলেন না। হতভাগ্য মোগল-সেনানীগণের অবস্থা কেহ জানিতেও পাইল না। এইরূপে সেই নিবিড় পর্ব্বত-গাত্রে হামির তাঁহার নূতন সাধনায় নিযুক্ত রহিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

আলাউদ্দীন যৎকালে ভস্মাবশেষ চিতোর
রিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, সেই সময় মাল-
বকে চিতোর-শাসনের ভারার্পণ করেন। মাল-
ব, জাতিতে ক্ষত্রিয়, কিন্তু যে সমুদায় সৎগুণ-
শি ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক, মালদেব-দেহে তাহার
কটীও ছিল না। আলাউদ্দীনের অনুগ্রহ-
খারী হইয়া—স্বদেশবাসীদিগের সহিত বৈরসাধন
রিয়া মালদেব চিতোরের শাসন-ভার গ্রহণ
রিলেন। মালদেবের কুটিল কটাক্ষ সর্ব্বদা
ন্দু প্রজাপীড়নের ছিদ্রান্বেষণ করিত। হত-
াগ্য হিন্দুগণ আর কোথায় যাইবে? কাহার
কট আর হৃদয়ের দুঃখ জানাইবে? জননী জন্ম-
মি, ম্লেচ্ছপদদলিত,—ম্লেচ্ছ যবনের প্রসাদভুক্

কাপুরুষ মালদেবের দুরন্ত শাসনে তাহাদিগের অস্থিপঞ্জর নিষ্পেষিত। চিতোরের বীরগণ যবনযুদ্ধে সকলেই দেহত্যাগ করিয়াছেন। যাহারা অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিতে অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহারাই প্রকৃত হতভাগ্য।

চিতোরবাসীর আর আশা ভরসা নাই। আশার একটী মাত্র ক্ষীণ-রশ্মি-রেখা হৃদয়ে ধারণ করিয়া তাহারা এ পর্য্যন্ত জীবন ধারণ করিয়া আছে। দৈব যদি অনুকূল হয়—চিতোর-রাজলক্ষ্মী যদি মুখ তুলিয়া দেখেন, তবে তাহাদের এ আশা সফল হইতে পারে। চিতোর-প্রজাবর্গের তবে সে কোন্ আশা? কোন্ আশায় হৃদয় বান্ধিয়া তাহারা আজ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে? শত নির্যাতন সহ্য করিয়া চক্ষের উপর অবলা ললনাকুলের অপমান দেখিতেছে? ইহা চিতোরবাসিগণের প্রাণের প্রাণ—হৃদয়ের আরাম, একমাত্র লক্ষ্যস্থল, রাণা লক্ষণসিংহের পৌত্র বীরবর হাম্মির।

মালদেব এই প্রকারে হিন্দুপ্রজাবর্গের পীড়ন করিয়া রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। মালদেবের পরিবারমধ্যে তাঁহার স্ত্রী ও একমাত্র লাবণ্যবতী কন্যা ক্ষেত্রকুমারী। ক্ষেত্রকুমারী শৈশবেই বিধবার বেশ পরিধান করে,—সত্যই মালদেব-দুহিতা শৈশবেই বিধবা। বালিকার সে কুসুম-সুকুমার বিনম্র মুখশ্রী যে একবার দেখিয়াছে, সে মুগ্ধ হইয়াছে! সে পবিত্র মুখকমল যে দেখিয়াছে, সে আর ভুলিতে পারে নাই। সৃষ্টির অমন সুন্দর পদার্থ পৃথিবীতে আসিয়া অনাঘ্রাত বন-ফুলের মত বনেই ফুটিয়া বনেই শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িবে, ইহা ভাবিতেও প্রাণে বড় কষ্ট হয়। ভগবান্ অমন সুন্দর চিত্র স্বহস্তে তুলিকা দ্বারা চিত্রিত করিয়াও তাহাকে সুখী করিলেন না। সরলা বালিকার কোমল প্রাণে চিরজীবনের জন্য তুষানল জ্বালাইবার জন্যই কি তাহা গড়িয়াছেন? অথবা আমরাই তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝি না;—তাঁহার মঙ্গল-

কার্য্যের অন্তরালে কি উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে, আমরাই তাহা বুঝিতে পারি না।

ক্ষেত্রকুমারী যৎকালে পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা, তখনই—সেই দুগ্ধপোষ্য শিশুর বিবাহ হয়। বিবাহের বৎসর উত্তীর্ণ না হইতেই ক্ষেত্রকুমারী বিধবা হইল। পঞ্চমবর্ষীয়া বালিকা, স্বামী কি জিনিষ, তাহা জানে না—বিধবা হইয়াও সে কান্দিল না। বালিকার দুঃখের অবসান এই খানেই হইল না—তাহার জননী সাংঘাতিক পীড়িতা হইলেন। তাঁহারও জীবনের আশা নাই। ক্ষেত্রকুমারীর মাতা যৎকালে মৃত্যুশয্যায় শয়ান, তখন স্বামীর চরণে মস্তক রাখিয়া, সপত্নী কমলাবতীর হাতখানি ধরিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহার হাতে হাতে ক্ষেত্র-কুমারীকে সমর্পণ করিয়া যান। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,—"ভগিনী! তুমি যখন আছ, আমার মেয়ের আর ভাবনা কি? ক্ষেত্রকুমারীর এক মা যাইবে, আর এক মা থাকিবে। আমি

তোমার হাতে হাতে ক্ষেত্রকুমারীকে সমর্পণ করিয়া চলিলাম, দে'খ বোন! আমার দুঃখিনী মে'য়েটীর যেন কষ্ট না হয়।" মুমূর্ষু মালদেববনিতা আরও যেন কি বলিতে চাহিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তাঁহার মুখশ্রীতে প্রকাশ পাইল, যেন একটা কিছু বাসনা তাঁহার অসমাপ্ত থাকিয়া গেল। স্বামীর পদযুগলে মস্তক রাখিয়া, স্নেহের ধন প্রাণাধিকা কন্যার হাতে হাত দিয়া, ভাগ্যবতী সতীসাধ্বী অমর-ধামে চলিয়া গেলেন।

মালদেববনিতা পাপ পৃথিবী ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। মালদেবের স্ত্রীবিয়োগ হইল, ক্ষেত্র-কুমারীর মাতৃবিয়োগ হইল, কমলাবতীর সাক্ষাৎ ভগিনী-স্থানীয়া সপত্নীর বিয়োগ হইল সত্য, কিন্তু পাঠক! ক্ষেত্রকুমারী আজ যে অমূল্যধন হারাইল, তাহার আজ যে ক্ষতি হইল, আর কাহারও এমনটি হইল না। কমলাবতীর এখন আর সপত্নী নাই, তিনি এখন অন্তঃপুরের একমাত্র কর্ত্রী। মাল-

দেবের কলত্র-বিয়োগ হইয়াছে, হয়ত কয়েকদিন পরে আর একজন সে স্থান অধিকার করিবে। কিন্তু হায়! ক্ষেত্রকুমারীকে আজ যিনি ছাড়িয়া গেলেন, তাহার অমন স্নেহময়, অমন শুভঙ্কর জন আর কেহ এ জগতে আছে কি? ক্ষেত্রকুমারীর ভাগ্যে আর অমন স্নেহমাখা ডাক আছে কি? ক্ষেত্রকুমারী হতভাগিনী। অনেক বালিকা শৈশবেই মাতৃহীনা হয়, কিন্তু যৌবনে, যুবতীর একমাত্র আরাধ্য, স্বামীর প্রেমময় আলিঙ্গনে স্বর্গসুখ ভোগ করে—স্বামীর আদর পাইয়া সকল কষ্ট যন্ত্রণা বিস্মৃত হয়, কিন্তু ক্ষেত্রকুমারীর অদৃষ্টে পোড়া বিধি বুঝি সে সুখও লেখেন নাই। বুঝি হতভাগিনী আজীবন তুষানলে জ্বলিবার জন্যই জন্মিয়াছিল,—বুঝি চিতোর-সরোবরের ফুল্ল শতদল অকালে বৃন্তচ্যুত হইতেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সংসারে সকলই অস্থায়ী। ধন মান, ঐশ্বর্য্য, শোক, তাপ, দুঃখ, সংসারে কিছুই স্থায়ী নয়।

জলস্রোতের মত সময়, মানবের সকল প্রকার অবস্থাকে পরিবর্ত্তিত করিতেছে। সংসারে শোকের যদি নিবৃত্তি না থাকিত, যন্ত্রণার যদি অবসান না হইত, দুর্ব্বল মানব-প্রাণের অস্তিত্ব তবে আর বেশী দিন থাকিত না। হৃদয়-ছেঁড়া ধন পুত্ত্ররত্নের অমঙ্গল আশঙ্কাও যে স্নেহময়ী জননীর প্রাণকে বজ্রের ন্যায় আঘাত করিত, যে প্রেমময়ী প্রেমদার পদে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইলে স্বামীর প্রাণ ক্ষত বিক্ষত হইত, যে প্রাণাধিক পতির অভাবে সাধ্বী স্ত্রী জীবিত থাকিবার কল্পনা করিতে পারিত না, যে হৃদয়সখা হৃদয়বন্ধুকে মুহূর্ত্তকালের নিমিত্তও চক্ষের অন্তরাল করিতে হৃদয়ে শত বৃশ্চিক দংশন করিত, সেই সেই প্রিয়জন কিনা কালের পরিবর্ত্তনে এই সকল প্রাণাধিক্ সুহৃদ্‌জনের অভাবেও হাসিতেছে—খেলিতেছে। হায়রে সংসার!

মালদেব, বনিতার শোক বিস্মৃত হইয়াছেন। কমলাদেবীর ভ্রমেও ক্ষেত্রকুমারীর মাতাকে স্মরণ

হয় না। এমন কি, মৃত্যুশয্যায় শয়ান থাকিয়া ক্ষেত্রকুমারীর জননী যে, অশ্রুপূর্ণলোচনে তাঁহারই হাতে ক্ষেত্রকুমারীকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, কমলাবতীর সে কথাও স্মরণ নাই। আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তি শত্রু হইলেও, তাহার কথা লোকে আজীবন স্মরণ করিয়া রাখে। কিন্তু ন্যায়, ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্যের পবিত্র মস্তকে পদাঘাত করিয়া কমলাবতী পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়াছেন। অকৃতজ্ঞতার—অধর্ম্মের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যদি কেহ দেখিতে চাও, মালদেবের অন্তঃপুরে প্রবেশ কর—কমলাবতীর শরীরে সুস্পষ্ট সে প্রমাণ পরিদৃশ্যমান। হায়! সংসারে সত্যই কি কৃতজ্ঞতা নাই? যে মালদেব কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর নিকট কতই ভালবাসা জানাইতেন, প্রেমপূর্ণ ঢলঢল নয়নে কতই না আদর করিতেন—আজ সেই মালদেব, স্বর্গীয়, পবিত্র দাম্পত্য প্রণয়ের নামে কলঙ্ক-কালিমা ঢালিয়া দিয়া স্বচক্ষে আপন দুহিতার দুর্দ্দশা দেখিয়াও নীরব! হত-

ভাগিনী ক্ষেত্রকুমারীর জননী বর্ত্তমানে যে মাল-দেব, তাহাকে কতই না ভালবাসিতেন, আজ কিনা দুর্ম্মুখ বনিতার ভয়ে কাপুরুষ মালদেব, মাতৃহীনা বালবিধবা দুহিতার শত নির্যাতন দেখিয়াও নির্ব্বাক্! হতভাগিনী ক্ষেত্রকুমারীর বিষাদ-মলিন মুখখানি যে একটীবার দেখিয়াছে, সেই ক্ষণ-কালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এ স্বর্গের সুন্দর ফুলে কোন্ কীট প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা ভাবিয়া আকুল হইয়াছে। আর কিনা জন্মদাতা পিতা কাপুরুষ মালদেব, মুখরা স্ত্রীর ভয়ে হত-ভাগিনী ক্ষেত্রকুমারীকে বারেকের জন্যও আদর করে না! হতভাগিনী বালিকা শৈশবে পতিহীনা হইয়াছে, শৈশবেই মাতৃহারা হইয়াছে; তাহার কোমল প্রাণে কি এ দুঃখ সহ্য হয়? পিতার নিকট ক্ষেত্রকুমারী উপস্থিত হইয়াই দেখিতে পায়, যে তাহার দর্শনমাত্র পিতার বদন অস্বাভা-বিক গম্ভীর আকার ধারণ করিল, আর সে মুখে

বাক্য নাই। মাতার নিকট গেল, দেখিল, কমলাবতী নাসিকা কুঞ্চিত করিলেন! মালদেবের সংসারে ক্ষেত্রকুমারী যেন কেহ নয়। দিন যাইতে লাগিল—দণ্ডে দণ্ডে, পলে পলে হতভাগিনীর দগ্ধ হৃদয় যেন তুষানলে তিল তিল করিয়া পুড়িতে লাগিল। জননী বর্ত্তমানে যে ক্ষেত্রকুমারীর পদে কাঁটার আঁচড় যাইতে পারে নাই, আজ কিনা সেই সোহাগের বালিকাই মাতৃ-হারা হইয়া একটি মিষ্ট কথার কাঙ্গাল! হায়! সংসারে কিছুরই প্রতিদান নাই! স্নেহের—দয়ার—ভালবাসার—উপকারের—কিছুরই প্রতিদান নাই! সংসারে কৃতজ্ঞতার যাহা কিছু আভাস দেখিতে পাই—হায়! তাহা যেন স্বার্থময়!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চিতোর-রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুর-সংলগ্ন একটী মনোহর পুষ্পোদ্যান। ক্ষেত্রকুমারীর আপন জননী, স্বামীকে অনুরোধ করিয়া এই মনোহর পুষ্পবাটিকা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ক্ষেত্রকুমারীর জননী স্বহস্তে উদ্যানটীর যত্ন করিতেন। ক্ষেত্রকুমারী তখন নিতান্ত বালিকা,—মাতার হাত খানি ধরিয়া একবার এ ফুল গাছের কাছে, আর একবার ও ফুল গাছটীর কাছে টানিয়া লইয়া বেড়াইত। উদ্যানটী ক্ষেত্রকুমারীর বাল্য খেলার স্থান ছিল। সে সমবয়স্কা বালিকাদিগের সহিত এই উদ্যানে লুকোচুরী খেলিত। সে দিন অনেক কাল চলিয়া গিয়াছে—ক্ষেত্রকুমারীর সুখের দিনও সেই সঙ্গে

সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। সে স্নেহময়ী জননী নাই—সে খেলিবার সাথীগুলি নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। বাল্যের সে সুখভরা হৃদয়টীও আর নাই। মা'য়ের হাতখানি ধরিয়া শৈশবে যখন ক্ষেত্রকুমারী কুসুমউদ্যানে অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত গোলাপ পুষ্পের মত নাচিয়া বেড়াইত, তখন কে মনে করিয়াছিল, শৈশবেই এ আনন্দময়ী বালিকা, সংসারের সকল সুখের আস্বাদন হইতে বঞ্চিতা হইবে। বালিকা ক্ষেত্রকুমারী, সমবয়স্কা বালিকা-দিগের সহিত যখন কুসুমোদ্যানে লুকোচুরী খেলিত, এবং বালিকার সুমধুর উচ্চহাস্য যৎকালে বীণা-স্বরের ন্যায় সমুদায় পুষ্পোদ্যানকে তন্ময় করিয়া তুলিত, তখন কে মনে করিয়াছিল, এই লাবণ্যময়ী বালিকা রাজ-অঙ্কে শোভা না পাইয়া শৈশবেই বিবাহিতা হইয়া, শৈশবেই বিধবা হইবে—শৈশবেই মাতৃহারা হইয়া বিমাতার বিষদৃষ্টিতে পতিত হইবে!

ক্ষেত্রকুমারীর বিষাদ-সমাকুলিত হৃদয় অনেক

সময় শৈশবের কথা ভাবিয়া শান্তি পাইত। সংসারের সকল সুখসম্পদ-বিহীন হইয়া গত জীবনের সুখময়-চিত্র-চিন্তায় প্রাণ আরও অধিকতর ব্যাকুল হয় সত্য, কিন্তু কে জানে কেন, বিষাদময়ী ক্ষেত্রকুমারী সে স্মৃতিতেও সুখ পাইত। হতভাগিনী বালিকা, অন্তঃপুরের শত নির্যাতন, অবনত-মস্তকে, নীরবে সহ্য করিয়া তাহার জননীর স্মৃতিচিহ্ন, শৈশব-সখী সেই কুসুমোদ্যানের সরোবর-সোপান-পংক্তির উপরে লাবণ্যলতিকা মাধবীলতাচ্ছায়ায় নির্জ্জনে বসিয়া শৈশবের সে মধুময় স্মৃতিরাজ্যে তাহার সমগ্র ক্ষুদ্র প্রাণটিকে ভাসাইয়া দিত। বালিকার ক্ষুদ্র প্রাণ তখন জগৎসংসার ভুলিয়া যাইত—অলক্ষ্যে অশ্রুধারা দুই গোলাপ-গণ্ড বহিয়া মুক্তাফলের ন্যায় ঝরিয়া পড়িত। ক্ষেত্রকুমারী এখন আর বালিকা নহে। দুর্দ্দমনীয় যৌবন-রাজ্যে সে এখন পদার্পণ করিয়াছে। যৌবন-স্বভাববশতঃ, বিশেষতঃ নিদারুণ যন্ত্রণার

পীড়নে ক্ষেত্রকুমারীর আর সে বালিকা-স্বভাব-সুলভ চপলতা নাই। সে এখন স্থিরা ও ধীরা। কিন্তু আজ্ তাহার প্রাণে যে জ্বালা জ্বলিয়াছে, তাহার আর ঔষধ নাই। বালিকার প্রাণকে আজ্ শত বিষাক্ত বিষধর দংশন করিতেছে। সে তীব্র বিষ-জ্বালা তাহার হৃদয় সম্যক্ উপলব্ধি করিতেছে, কিন্তু প্রাণ বহির্গত হইতেছে না। হায়! তুমি আমি সে যাতনা বুঝিব কি প্রকারে? যে কখন সামান্য কণ্টকাঘাত সহ্য করে নাই, সে আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব-বিহীনা—বিমাতা কর্ত্তৃক উৎপীড়িতা, মাতৃহীনা বাল-বিধবার প্রাণের যাতনা বুঝিবে কি প্রকারে?

বালিকা বহুক্ষণ একাসনে সেই মাধবীলতা-চ্ছায়ায় সরোবর-সোপানে বসিয়া তপ্ত অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতেছিল। সূর্য্য অনেকক্ষণ ডুবিয়া গিয়াছে। প্রকৃতি সতী ক্রমে ঘোর তামস বসন ধারণ করিতেছেন, কিন্তু ক্ষেত্রকুমারীর প্রাণ জড় অনেক রাজ্য বিচরণ করিতেছে,

দিবাকরের অস্ত-গমন সে লক্ষ করে নাই। অগাধ চিন্তায় ক্ষণেকের জন্য সে তাহার বিমাতার তীব্র রোষকষায়িত নয়ন ভুলিয়া গিয়াছিল।

বহুক্ষণ ক্ষেত্রকুমারী অন্তঃপুরে নাই। সন্ধ্যাও হইয়া আসিয়াছে, ইহা দেখিয়া লক্ষ্মী, ক্ষেত্রকুমারীকে খুঁজিতে ছুটিল। লক্ষ্মী, মালদেবের দূরসম্পর্কীয়া কোন আত্মীয়-কন্যা। তাহার পিতামাতার বিয়োগের পর মালদেব অনুগ্রহ-পূর্ব্বক তাহাকে নিজ অন্তঃপুরে আশ্রয় দিয়াছিলেন। বয়স্থা হইলে সে বিবাহিতা হইয়াছিল। লক্ষ্মী, রূপে গুণে অতুলনীয়া—লক্ষ্মী সধবা এবং স্বামিসোহাগিনী। বিষাদিনী ক্ষেত্রকুমারীর সখী-স্থানীয়া—ভগিনী-স্থানীয়া একমাত্র লক্ষ্মীই অন্তঃপুরে ছিল। সময়ে সময়ে সহৃদয়া লক্ষ্মীর কাছে হৃদয় খুলিয়া ক্ষেত্রকুমারী অনেকটা শান্তি পাইত। তাই আজ্ লক্ষ্মী, বহুক্ষণ প্রিয় সখী ক্ষেত্রকুমারীকে দেখিতে না পাইয়া তাহার উদ্দেশে ছুটিল। একবারে কুসুম-

উদ্যানে গিয়া উপস্থিত হইল। সরোবরের নিকট-বর্ত্তী হইয়া লক্ষ্মী বিস্ময়রুদ্ধ-কর্ণে শুনিতে লাগিল, হৃদয়োন্মাদিনী, বিষাদবিজড়িত স্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ক্ষেত্রকুমারী গীত গাহিতেছে। সে স্বর যাইয়া লক্ষ্মীর হৃদয়তন্ত্রীতে সবেগে আঘাত করিল। ধীরে—অতি ধীরে লক্ষ্মী যাইয়া বালিকার পশ্চাতে দাঁড়াইল। ক্ষেত্রকুমারী, লক্ষ্মীর উপস্থিতি জানিল না,—বিষাদিনীর মত, উন্মাদিনীর মত গাহিতে লাগিল। লক্ষ্মী, অশ্রুপূর্ণ লোচনে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল, বালিকা গাহিতেছে,—

রাগিনী বারোঁয়া—তাল ঠুংরি।

দিবানিশি ব্যথিত জীবন,
পতন না হ'তে দেহ হ'তেছে দহন।
জীবন-পথ অন্ধকার, প্রাণে উঠে হাহাকার,
ঝর ঝর অশ্রুধার তাহে অনুক্ষণ।
জনমিয়াবধি আমি দুখের সাগরে ভাসি,
না হ'লো তাঁহারি সাথে আঁখির মিলন।

গীত-সমাপ্তি-মাত্র ক্ষেত্রকুমারী একটু চকিত হইয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, তাহার হৃদয়-সখী লক্ষ্মী, অশ্রুপূর্ণ নয়নে সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। সমদুঃখভাগিনীকে দেখিয়া বালিকার দুঃখাবেগ যেন আরও উথলিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ লক্ষ্মীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া, তাহার বক্ষে মস্তক রাখিয়া ক্ষেত্রকুমারী ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ দুই ভগিনী আলিঙ্গনে আবদ্ধা থাকিয়া প্রাণে যেন বড়ই শান্তি পাইল। তখন লক্ষ্মী, কাঁদিতে কাঁদিতে ক্ষেত্রকুমারীর মুখখানি দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া বাম হস্তদ্বারা অঞ্চল দিয়া চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিল, "সখী! চল, রাত্রি হইয়াছে, এখন অন্তঃপুরে যাই।" বলিবামাত্র ক্ষেত্রকুমারী মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় লক্ষ্মীর পশ্চাৎ অনুসরণ করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

যৎকালে বীরবর হামির আপনার পিতৃপুরুষের প্রনষ্ট গৌরবের উদ্ধার-সাধনায় বনে বনে, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, অনাহারে অনিদ্রায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন ; যৎকালে কুলাঙ্গার স্বদেশীয় কর্ত্তৃক উত্তেজিত মোগলসৈন্যগণ কর্ত্তৃক শান্ত নিরীহ হিন্দু প্রজাবর্গ অমানুষিক সহিষ্ণুতাগুণে কঠোর উৎপীড়ন সহ্য করিতেছিল, যৎকালে বীরেন্দ্রমণ্ডলীর লীলা-নিকেতন—রাজস্থানের সতী-সীমন্তিনীগণের বিরাম স্থল, বীর-পূজ্য চিতোর ম্লেচ্ছযবনের করায়ত্ত হইয়া অশেষ অত্যাচার হৃদয়ে বহন করিয়া অবিশ্রান্ত অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতেছিল, এমন সময় এক

দিন মালদেবের নিকট হইতে একটী বিবাহ-সম্বন্ধ আসিল। চিতোর-রক্ষক মালদেব, হামিরের সহিত তাঁহার একমাত্র কন্যার পরিণয় প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছেন। এই ভয়াবহ সঙ্কট-সঙ্কুল সময়ে, চিরশত্রু মালদেব কি ভয়ঙ্কর অভিপ্রায় সাধনের নিমিত্তই বা এ আকস্মিক প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, ইহা হামিরের হিতৈষী মন্ত্রিবর্গ কেহই অনুমান করিতে পারিলেন না। অবশ্যই ক্রূরমতি মালদেব, হামিরের প্রতি বিশেষ কোন বৈরতাসাধনের নিমিত্তই এ প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে হামির মালদেবের সর্ব্বপ্রধান শত্রু, যে হামির চিতোর-সিংহাসন হইতে মালদেবকে বিতাড়িত করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যস্ত, যে হামির, মালদেবের হিতৈষী মোগল-কুলকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত অনুক্ষণ তৎপর, আজ তাঁহার সেই চিরশত্রু হামিরের করে কি উদ্দেশ্যে আপন দুহিতাকে সমর্পণ করিতে অগ্রসর? উপস্থিত এই মাঙ্গলিক

অনুষ্ঠানের অভ্যন্তরে আবার কোন ক্রূরতাময় অভিপ্রায় প্রচ্ছন্নভাবে লুক্কায়িত আছে কিনা, মিবার-রাজমন্ত্রিগণের মনে সেই সম্বন্ধে গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইল। উভয়পক্ষের এই ভয়াবহ শত্রুতাসময়ে মালদেব কি অভিপ্রায়ে হামিরের নিকট নারিকেল ফল* প্রেরণ করিলেন, ইহা ভাবিয়া তাঁহারা চিন্তিত হইলেন।

এদিকে হামির, মন্ত্রিগণের উপস্থিত আশঙ্কার প্রতি আস্থা দেখাইলেন না, বরং মালদেবের এই পরিণয়প্রস্তাবে আন্তরিক বড়ই আনন্দিত হইলেন। হামির তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,— "মালদেবসম্বন্ধে অমূলক আশঙ্কা করিয়া তোমরা কেন চিন্তিত হইতেছ? তাঁহার মনে সত্যই যদি কোন দুরভিসন্ধি লুক্কায়িত থাকে, তবে থাক্, আমি

* রাজপুত-জাতিদিগের মধ্যে ইহা বিবাহ-সম্বন্ধ-সূচক একটী নিদর্শন-স্বরূপ।

তাহাতে ভীত নহি। অতএব আমি নারিকেল ফল গ্রহণ করিলাম। তোমরা বাধা দিও না।" মন্ত্রি- বর্গ ভবিষ্যৎ অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া চিন্তিত হইতে- ছিলেন, কিন্তু হামিরের নিতান্ত আগ্রহ দেখিয়া পুনরায় নিবারণ করিতে সাহস করিলেন না।

হামির, মালদেবের দুরভিসন্ধি বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু কিসের আশায় নারিকেল ফল গ্রহণ করি- লেন? হামির কিসের আশায় রাজ্যের প্রধান প্রধান হিতৈষী ব্যক্তির অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন? এই আশা যে তাঁহার সেই পিতৃপুরুষগণের লীলা-নিকে তন, বীরেন্দ্রমণ্ডলীর আবাসভূমি, রাজস্থানের ফুল্ল সরোজিনী সতী সীমন্তিনীগণের বিরামস্থল, তাঁহার সেই একমাত্র আরাধ্যভূমি চিতোরপুরী একটীবার মাত্র দেখিতে পাইবেন। যে চিতোরপুরীতে তাঁহার পিতৃপুরুষগণ সানন্দমনে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন, যে চিতোরপুরীতে একাধারে স্বাধী- নতা, শান্তি ও আনন্দ অনুক্ষণ বিরাজ করিত, এই

উপলক্ষে হামির তাহাই একবার দেখিতে পাইবেন। যে হামির বাল্যকাল হইতেই স্বদেশের কল্যাণ-কামনার নিমিত্ত জীবন উৎসর্গীকৃত করিয়াছেন, যিনি চিতোরের নিমিত্ত হৃদয়ের বিন্দু বিন্দু শোণিত নিঃসারণ করিতেছেন, তাঁহার পক্ষে এ চিন্তাও কি সামান্য সুখের? যে হামির চিতোরের দুর্দ্দশা দেখিয়া অনুক্ষণ বিষণ্ণ থাকিতেন, যিনি চিতোর-উদ্ধার-আশায় নিরাশ হইয়া সময় আর বুঝি পাইলাম না, আর বুঝি হইল না, আর বুঝি একটী-বারও দেখিতে পাইলাম না, ভাবিয়া নির্জ্জনে বসিয়া অবিরল ধারায় অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতেন, আজ, চিতোরের তেমন সুহৃদ্, তেমন হিতৈষীর পক্ষে চিতোর-সন্দর্শনের আশাও প্রাণকে কি প্রকার সুখিত করে, তাহা যিনি ভুক্তভোগী, তিনিই বুঝিতে পারেন।

অতি শীঘ্রই হামিরের বিবাহ-যাত্রার সকল বন্দোবস্ত হইয়া গেল। বহুতর সৈন্যসামন্ত সঙ্গে

লইয়া, মহা ঘটা ও আড়ম্বরে যুবকবীর হামির, চিতোরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। বিবাহের কথা তিনি ভাবিতেছিলেন না, কাহার সহিত পরিণীত হইবেন, সে চিন্তা করিতেছিলেন না, একমাত্র চিতোর-সন্দর্শন-আশা তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক ছিল। এ সুখের চিন্তায় তাঁহার প্রাণ আনন্দে নাচিতেছিল। এ বিবাহপ্রস্তাবে হামির কেন যে এত আগ্রহ দেখাইলেন, তাহা রাজ্যের কেহই বুঝিতে পারিল না। হামিরের হৃদয়ে প্রচ্ছন্নভাবে যে অভিসন্ধি লুক্কায়িত ছিল, জগতের কেহই তাহা জানিত না।

ক্রমে হামির চিতোরের নিকটবর্ত্তী হইলেন। দূর হইতে চিতোরের সমুন্নত দুর্গচূড়া দেখা যাইতে ছিল ; দূর হইতে পিতৃরাজ্য দর্শন করিয়া হামিরের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইল। অবিলম্বে তিনি দুর্গদ্বারে উপস্থিত হইলেন। কন্যাপক্ষীয় কুটুম্বগণ হামিরকে মহা আহ্লাদের সহিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। কিন্তু

হামির নগর-প্রবেশমাত্র বিবাহ-উৎসব-সম্বন্ধীয় কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান দেখিতে পাইলেন না। দুর্গদ্বারে পরিণয়-নিদর্শন-সূচক কোন অনুষ্ঠান না দেখিয়া তিনি অতিশয় চিন্তিত হইলেন। নানা সন্দেহের বিষম তাড়নায় তিনি বড়ই ব্যস্ত হইলেন, কিন্তু পরক্ষণেই তিনি ধৈর্য্যের সহিত সকল ব্যাপারের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে চিতোর-দুর্গের অন্তঃপুর-প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন। আজ বহুদিনের আশা সফল হইল—আজ আরাধ্য পিতৃ-পুরুষগণের বিশাল কীর্ত্তি-নিকেতন চক্ষে দেখিয়া হামির চক্ষু সার্থক জ্ঞান করিলেন। জীবনের সেই সর্ব্বপ্রথম দিন, পিতৃপিতামহগণের কীর্ত্তিস্তম্ভ দেখিতে লাগিলেন—হৃদয় ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে তিনি বিবাহসভায় উপনীত হইলেন। সেখানে মালদেব, তাঁহার আত্মীয় কুটুম্ব, সর্দ্দারগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া কৃতাঞ্জলি-হস্তে মহাসম্মান-সহকারে হামিরকে গ্রহণ

করিলেন। অবিলম্বে বিবাহসভায় কন্যা আনীতা হইল; অবিলম্বে হামিরের হস্তে মালদেব-কন্যার বিকম্পিত হস্ত একত্রিত হইল; পরস্পরের বস্ত্রাগ্রভাগ একত্র বন্ধন করা হইল। পুরোহিত ও মালদেব, কন্যাজামাতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। বিবাহসভা ভাঙ্গিয়া গেল। বরকন্যা তৎক্ষণাৎ বাসরঘরে আনীত হইল। বাসর ঘরে বরকন্যা একত্রিত আছেন, কিন্তু হামিরের চিত্ত নিতান্ত চিন্তাযুক্ত ও অন্যমনস্ক; কি যেন এক গভীর চিন্তা তাঁহার প্রাণকে প্রতিক্ষণে আলোড়িত করিতেছে। অদূরে অবগুণ্ঠনাভ্যন্তর হইতে একটী ভুবনমোহিনী বালিকা তাহা লক্ষ্য করিল। বালিকা যেন সকলই বুঝিল। তৎক্ষণাৎ বালিকার অবগুণ্ঠন খসিল—সেই অবগুণ্ঠনাভ্যন্তর হইতে যেন একটী দেবীমূর্ত্তি হামিরের পদমূলে আসিয়া দাঁড়াইল। হামির জীবনে অমন সুন্দরী দেখেন নাই। তিনি স্তম্ভিত হইলেন। তখন বালিকা নীরবে হামিরের পদে হস্তার্পণ

করিয়া যেন হৃদয়ভেদী, দুঃখবিজড়িতস্বরে কম্পিত-কণ্ঠে বলিতে লাগিল—

"প্রাণেশ্বর! হৃদয়দেবতা! আজ আমার এ প্রগল্‌ভতার জন্য ক্ষমা করিবেন। আপনার প্রাণে কিজন্য যন্ত্রণা হইতেছে, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি। পিতা কিজন্য এ প্রকারে আমার সহিত আপনাকে পরিণীত করিলেন, আমি তাহা জানি, যদি এ হতভাগিনীকে ক্ষমা করিয়া স্বামিন্! ঐ অভয়পদে স্থান দান করিয়া অনুমতি করেন, তাহা হইলে আপনার শ্রীচরণে সকল নিবেদন করি।"

হামির যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন। কুসুমসুকুমার বালিকার কথা শুনিয়া হামির যেন চমকিয়া উঠিলেন। তিনি বালিকার মুখমণ্ডলে দৃষ্টিপাত করিলেন,—দেখিলেন, তাহা পবিত্রতার আধার; সরলতা সে আস্যে যেন বিরাজমানা। বালিকার সে অপরূপ সৌন্দর্য্যের মধ্যে মুখমণ্ডলে

যেন একটী ম্রিয়মাণ বিষাদজড়িত ছায়া প্রকাশ পাইতেছিল। এ অপরূপ দৃশ্য জগতে দুর্লভ। বালিকা স্বামীর নিকট কাতরকণ্ঠে, ব্রীড়াবিষাদ-জড়িত-স্বরে যে আশ্রয় ভিক্ষা চাহিয়াছিল, সহৃদয় হামিরের পরদুঃখকাতর হৃদয় তাহাতে গলিয়া গেল। তখন সেই ছিন্নলতিকা কোমলবল্লরী যে প্রকার বাতাহত হইয়া আশ্রয়-বৃক্ষের পাদদেশে লুটাইয়া পড়ে, তাহারই মতন, স্বামীর পদপ্রান্তে পতিত প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী, আশ্রয়ভিখারিণী, বিবশা বালিকাকে হামির অতি যত্নে, অতি আদরে, অতি সস্নেহে হৃদয়ে তুলিয়া লইলেন। স্বামীর অতি সোহাগে বালিকা আনন্দে অধীর হইয়া অশ্রুপূর্ণ-নয়নে স্বামীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া জীবন ধন্য বোধ করিতে লাগিল। তখন আদরে, সস্নেহে হামির, তাহার গূঢ় অভিপ্রায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বালিকা বলিতে লাগিল,—

"স্বামিন্! আমাকে উপেক্ষা করিবেন না;

আমি শৈশবেই বিধবা। অতি শৈশবেই ভট্টীবংশীয় রাজকুমারের সহিত আমার বিবাহ হয়। বিবাহের কথা আমার কিছুমাত্র স্মরণ নাই। বিধবা হইবার অব্যবহিত পরেই আমি মাতৃহীনা হই ; সেই অবধি আমি অনাথিনী। নাথ ! আমাকে উপেক্ষা করিবেন না।”

সরলা বালিকা আর বলিতে পারিল না। স্বামীর পদপ্রান্ত ধরিয়া ফুঁপিয়া ফুঁপিয়া কাঁদিতে লাগিল। হামির, মালদেবের সকল কৌশল বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ বালিকাকে সান্ত্বনা করিলেন, হৃদয়ে আশ্রয় দিলেন, তাহার সারল্য ও পতিপ্রেম দেখিয়া হামির মুগ্ধ হইলেন। মালদেব কৌশলে হামিরকে বিধবা-বিবাহ দিয়া অবমানিত করিলেন, এ অবমাননা, এ নির্যাতন তিনি তাঁহার প্রেমময়ী স্ত্রীর বিষাদ-বিজড়িত সারল্যময়ী মুখ খানি দেখিয়া সহ্য করিলেন। আজ্ শত অবমাননা, শত নির্যাতনের মধ্যেও

হামির সেই পতিপ্রাণা সরলাবালাকে হৃদয়ে লইয়া অশেষ সান্ত্বনা পাইলেন।

আমাদের হতভাগিনী ক্ষেত্রকুমারী আজ্ আর হতভাগিনী নয়। আজ্ সে স্বামীর ভালবাসা পাইয়াছে, স্বামীর সে অগাধ প্রেমের পরিমাণ না পাইয়া তাহার শরীর মন সে প্রেম-সমুদ্রে ভাসাইয়া দিয়াছে। হতভাগিনী ক্ষেত্রকুমারী আজ রাজরাণী! রাজরাণী হইতেও সুখী—সে আজ আদরিণী, পতি-প্রেমাধিকারিণী!!

ক্ষেত্রকুমারীর গর্ভধারিণী, মৃত্যু-শয্যায় শুইয়া যখন কি একটা কথা বলিতে না পারিয়া অব্যক্ত-ক্লেশের ভাব দেখাইয়া সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, বুঝি ভগবান্ আজ তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিলেন। পুষ্পোদ্যানের সরোবর-সোপান-পংক্তির উপর, জলাসন্নমাধবীলতাচ্ছায়ায় বসিয়া ক্ষেত্রকুমারী দুঃখবিজড়িত-স্বরে যে গীত গাহিয়া অবিশ্রান্ত উষ্ণ অশ্রুজল সরোবর-জলে মিশাইতে-

ছিল, বুঝি অনাথের নাথ তাহাই দেখিয়া আজ ক্ষেত্রকুমারীকে অতুল-সম্পদের অধিকারিণী করিলেন। কে বলে যন্ত্রণার অবসান নাই? ক্ষেত্রকুমারী অশেষ যন্ত্রণা ভুগিয়া কৈ এক দিনের জন্যও মনে করে নাই, সে এমন সুখের অধিকারিণী হইবে। কিন্তু আজ সে তাহার স্বামীর বক্ষে মস্তক রাখিয়া কতই না সুখের হাসি হাসিতেছে!

ক্ষেত্রকুমারী, স্বামীর মনোবেদনা বুঝিতে পারিয়াছে। মালদেব যে তাহার স্বামীর পবিত্রকুলে কলঙ্ক লেপন করিবার জন্যই এ প্রকার কৌশলজাল বিস্তার করিয়াছিলেন, বালিকা ক্ষেত্রকুমারী তাহা বুঝিতে পারিল। তখন পতিপ্রাণা ক্ষেত্রকুমারী স্বামীকে নানারূপে সান্ত্বনা দিয়া যাহাতে ভবিষ্যৎকালে তাঁহার এ অবমাননার প্রতিশোধ লইতে পারেন, তাহার পরামর্শ দিতে লাগিল। তাঁহার পিতৃপুরুষগণের আবাসস্থল কিরূপে তিনি কৌশলপূর্ব্বক হস্তগত করিতে

পারেন, পতিপ্রাণা বালিকা, স্বামীকে সে পরামর্শও প্রদান করিল। হামির তাঁহার প্রিয়তমার একান্ত পতিভক্তি ও তাহারই মুখে চিতোর-উদ্ধারের আশা শুনিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। ক্ষেত্রকুমারীর সহিত এ আকস্মিক পরিণয়-ব্যাপারের অভ্যন্তরে হামির চিতোর-রাজলক্ষ্মীর পরম মঙ্গল উদ্দেশ্য দেখিতে পাইলেন। যে চিন্তার বিষদংশনে হামিরের হৃদয় অনুক্ষণ ব্যথিত থাকিত; যাহার নিমিত্ত তিনি রাজ্য-সুখ-সম্পদ, ধনজনমান, এমন কি মন প্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন; যাহার আশায় তিনি কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া হৃদয়ের বিন্দু বিন্দু শোণিতপাত করিতেছিলেন, আজ হৃদয়ের আরামদায়িণী, জীবনতোষিণী পতিব্রতা ভার্য্যাকে তাঁহার সমদুঃখভাগিনী দেখিয়া আনন্দে, উল্লাসে, ও আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পতিব্রতা ভার্য্যা সকল বিষয়ে তাঁহার সহধর্ম্মিণী, ইহা ভাবিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইলেন।

যাহা হউক, অবিলম্বে কন্যাপাত্রযাত্রার দিন উপস্থিত হইল। হামির, ক্ষেত্রকুমারীর পরামর্শানুসারে মালদেবের নিকট হইতে এক জন বিচক্ষণ সর্দ্দার প্রার্থনা করিলেন। মালদেব অনিচ্ছা-সত্ত্বেও জামাতার প্রার্থনা অবহেলা করিতে পারিলেন না, অগত্যা তাঁহার সভাস্থ জলধরনামক জনৈক সর্দ্দারকে যৌতুকস্বরূপ দান করিলেন।

হামির, জলধরকে সঙ্গে লইয়া আপন বনিতার সহিত মহা আড়ম্বরে নিজ রাজধানীতে গমন করিলেন। ধূর্ত্ত মালদেব, হামিরকে কৌশলজালে পাতিত করিয়াছে ভাবিয়া অন্তরে অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিল, কিন্তু যৎকালে হামির, ক্ষেত্রকুমারীকে সঙ্গে লইয়া চিতোর-নগরের তোরণ-দ্বার অতিক্রম করিলেন, সেই মুহূর্ত্তে চিতোরনগরী সহসা এক প্রবল ভূকম্পনে কাঁপিয়া উঠিল, সেই সঙ্গে সঙ্গে মালদেবের হৃদয়ও অকস্মাৎ কম্পিত হইয়া উঠিল।

আজ্ মিবারের গৃহে গৃহে আনন্দের রোল উঠিয়াছে। আজ্ মিবারের অসংখ্য নরনারী, আবাল-বৃদ্ধ-যুবা তাহাদের নূতন রাণীকে দেখিবার জন্য ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়াছে। প্রতি অট্টালিকার চূড়ায় পতাকা উড়িতেছে, প্রতি গৃহদ্বারে কদলীবৃক্ষ ও বিবিধ মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সকল সজ্জিত হইয়াছে। মিবারের নিতান্ত দরিদ্র ভিক্ষুক যে, তাহার ক্ষুদ্র কুটীরের সম্মুখেও কিছু না কিছু মাঙ্গলিক চিহ্ন বিদ্যমান রহিয়াছে। আজ্ মিবারের কত পুত্র-হারা, প্রাণের পুত্তলী হারাইয়া, কত পতিবিয়োগ-বিধুরা, প্রাণাধিক পতি হারাইয়া, কত শোকার্ত্ত, শোকে মুহ্যমান থাকিয়াও ক্ষণেকের জন্য সকল জ্বালা যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া তাহাদের সেই জননী-সদৃশী মহিষীকে দেখিবার জন্য ছুটিয়াছে। আজ্ মিবার-রাজপ্রাসাদে অপূর্ব্ব শোভা। বর্ণে বর্ণে পতাকা সকল মন্দ মন্দ বায়ু-হিল্লোলে দুলিতেছে, নানা মনোহর পুষ্পের সুস্নিগ্ধ সুবাসে চতুর্দ্দিক্

আমোদিত হইয়াছে। নানাপ্রকার সুমধুর বাদ্যে, ও বহুলোকের আনন্দ-কোলাহলে রাজপ্রাসাদ যেন আনন্দভরে নাচিতেছে। নবদম্পতি অবিলম্বে প্রাসাদে উপনীত হইলেন—সকলেই প্রাণ ভরিয়া আশীর্ব্বাদ করিল। প্রথমে কতিপয় ব্যক্তি হামিরের জয়ঘোষণা করিল,—দুইটী, দশটী করিয়া ক্রমে অযুতকণ্ঠে সে ধ্বনি গীত হইল। আনন্দে ইষ্ট-দেবতাকে স্মরণ করিয়া হামির তাঁহার প্রিয়তমার হস্ত ধারণ করিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।
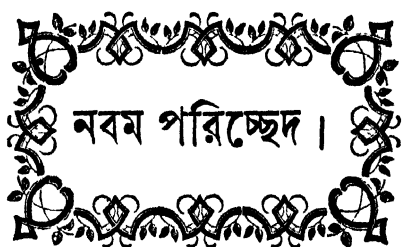
হামিরের বিবাহের পর কয়েক বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। ক্ষেত্রকুমারী একটী পুত্ত্রসন্তান লাভ করিয়াছে। এ আনন্দ-সমাচার প্রচার হইবা-মাত্র মিবারের গৃহে গৃহে আনন্দরোল পড়িয়া গেল, কয়েক দিন মিবারবাসী সকল কার্য্য ভুলিয়া গিয়া এ আনন্দোৎসবে মাতিয়া গেল। অতি দীন দরিদ্র যে, সেও চীরবাস পরিত্যাগ করিয়া নববস্ত্র পরি-ধান করিল। অবিলম্বে মালদেব এ আনন্দবার্ত্তা শুনিতে পাইলেন।

ক্রমে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। নবজাত কুমার দিনদিন মাতৃক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

ক্রমে কুমার যৎকালে দ্বাদশ মাসে পদার্পণ করিয়াছে, এমন সময় জ্যোতিষগণক আসিয়া বলিল,—"চিতোর-দেবতা ক্ষেত্রপালের আক্রোশ কুমারের প্রতি পতিত হইয়াছে, যদি শীঘ্র দেব-আক্রোশ নিবারণ না হয়, তবে কুমারের সমূহ অনিষ্টাশঙ্কা।" ক্ষেত্রকুমারী চিতোরের পুত্রকদেবতার পূজা দিতে চিতোর-যাত্রার আয়োজন করিল। অবিলম্বে দিন স্থির হইল,—শুভ দিনে, শুভলগ্নে ক্ষেত্রকুমারী পুত্রক্রোড়ে পিত্রালয় যাত্রা করিল। ক্ষেত্রকুমারীর হৃদয়ে পুত্র-মঙ্গল-কামনার সঙ্গে সঙ্গে আর একটী আশা গূঢ়ভাবে প্রচ্ছন্ন ছিল। প্রাণাধিক্ স্বামীর হৃদয় যে আশার মোহিনী-মন্ত্রে সর্ব্বদা আন্দোলিত হইত, পিত্রালয়ে থাকিয়া তাহারই সহায়তা করিতে পারিবে ভাবিয়া মনে মনে বড়ই আহ্লাদিত হইল। ক্ষেত্রকুমারী অতি অল্পকালের মধ্যেই পিত্রালয়ে উপনীত হইল। আজ ক্ষেত্রকুমারীর উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গে চিতোরের যে

সৌভাগ্য-দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়া গেল, তাহা আর শীঘ্র কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিল না।

ক্ষেত্রকুমারী চিতোরে আসিয়া দেখিল, মালদেব তাঁহার দূরস্থ শত্রু মীরগণকে দমনাভিপ্রায়ে চিতোরের অধিকাংশ সৈন্যসামন্ত সঙ্গে লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। আজ্ যেন হামিরের ভাগ্যলক্ষ্মী প্রসন্না হইয়াছেন—চিতোরের রাজলক্ষ্মী আজ যেন চিতোরবাসিদিগের অবিশ্রান্ত অশ্রুজলে ব্যথিত-হৃদয়া হইয়া তাহাদিগকে অশেষ ক্লেশ যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দিতে অগ্রসর হইয়াছেন। অবিলম্বে সর্দ্দার জলধর, হামিরের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। এ সংবাদ শুনিয়া হামিরের বিশাল চক্ষু হইতে অমানুষিক জ্যোতিঃ নির্গত হইতে লাগিল। হামির আজ একবার প্রাণ ভরিয়া ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিলেন, একবার প্রাণ ভরিয়া পরমারাধ্য পিতৃপুরুষগণকে স্মরণ করিলেন। তৎপরে অবিলম্বে সমগ্র মিবার-ভূমে এ শুভসংবাদ প্রচার করিয়া দিয়া সর্দ্দার ও

সেনানীগণসহিত অতি বেগে চিতোরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। আজ হামিরের প্রচণ্ড তেজ প্রতিহত করে কাহার সাধ্য? জননী জন্মভূমির উদ্ধার-সঙ্কল্পে আজ হামিরের বিশাল বাহু যে প্রচণ্ড অসি ধারণ করিয়াছে, তাহা অজেয়। হামির অবিলম্বে চিতোর-দ্বারে উপনীত হইলেন। মাল-দেব-পরিত্যক্ত যে কিছু সামান্যমাত্র সৈন্য অব-শিষ্ট ছিল, হামিরের প্রচণ্ড অসির প্রচণ্ড আঘাতে তাহা, ভয়াবহ বাত্যার সম্মুখে শুষ্ক বটপত্রের ন্যায় উড়িয়া গেল। আজ পরমারাধ্য পিতৃপুরুষগণের লীলা-নিকেতন, বহুদিনের আরাধ্য চিতোর, পরা-ধীনতার কঠোর নিগড় হইতে উদ্ধার পাইল। আজ হামিরের কঠোর সাধনার সিদ্ধি হইল।

মালদেবের কঠোর শাসনে অত্যাচারিত, অস্থি-পঞ্জর-বিহীন, বিশুষ্কবদন চিতোরের নরনারী আজ্ তাহাদের প্রকৃত রাজাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। যে আশায় বুক বান্ধিয়া তাহারা মালদেবের শত

নির্যাতন, শত অত্যাচার সহ্য করিয়াও জীবিত ছিল, আজ সেই একমাত্র আশাস্থল, চিতোরবাসিগণের হৃদয়দেবতা রাজাকে পাইয়া তাহারা আনন্দে উন্মত্তপ্রায়। দলে দলে অগণিত লোক-সমুদ্র হামিরকে দেখিতে ছুটিয়াছে। চিতোর-রাজপ্রাসাদ আজ অসংখ্য ব্যক্তির অসংখ্য কণ্ঠ-ধ্বনিতে আন্দোলিত, আজ চিতোরের রথ্যাসমূহ হামিরের জয়ধ্বনিতে পরিপূর্ণ, মুহুর্মুহু তোপ-ধ্বনিতে চিতোর-দুর্গ প্রকম্পিত। প্রজাবৎসল হামির, সমুদায় প্রজামণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া অতি কোমল, অতি সস্নেহ অথচ তেজোগম্ভীরস্বরে অভয়প্রদান করিলেন। তিনি তাহাদিগের দুঃখে সত্য সত্যই কত দুঃখী, তাহাদিগের পরাধীনতায় তিনিও হৃদয়ে কত যন্ত্রণা পাইয়াছেন, তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত কত কষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন, আজ আনন্দাশ্রুপুলকিতান্তঃকরণে তাঁহার প্রজাগণের নিকট সেই সব কথা খুলিয়া

বলিলেন। নিপীড়িত মিবারবাসী আজ্ হামিরকে পাইয়া তাঁহার মুখে এই সকল কথা শুনিয়া আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিল। হামির আজ চিতোর উদ্ধার করিয়া প্রশস্ত দুর্ব্বাক্ষেত্রে সমবেত মিবারবাসিদিগকে লইয়া সুখদুঃখের কথা শুনিতেছেন ও শুনাইতেছেন। অসংখ্য মিবারবাসী উন্মত্তের মত সকলেই রাজার পবিত্র পদধূলি গ্রহণ করিতে ব্যতিব্যস্ত। সে অসংখ্য ব্যক্তির ভয়ঙ্কর সংঘর্ষণে কত শত ব্যক্তি নিষ্পেষিত-প্রায় হইয়াও দৃক্‌পাত করিতেছে না। সকলেই রাজ-চরণামৃত-গ্রহণে ব্যস্ত। তখন চিতোরেশ্বর হামির, সস্মিত-বদনে সে দিনের জন্য সকলকে বিদায় দিয়া রাজ-প্রাসাদে প্রবেশ করিলেন। তিনি একবার আনন্দাশ্রুসিক্ত নয়নে বহু-আরাধ্য ধন পিতৃপুরুষ-গণের লীলানিকেতন চিতোরকে প্রাণ ভরিয়া দেখিলেন—বহুক্ষণ সেই প্রশস্ত প্রাসাদের প্রশস্ত চত্তলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রাণ ভরিয়া দেখিতে

লাগিলেন। দেখিয়াও তৃপ্তি হইল না। তখন ধীরে ধীরে হামির অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন— পৌর স্ত্রীগণ মুহুর্ম্মুহুঃ উলুধ্বনি দিতে লাগিল।

হামির তখন যে ঘরে ক্ষেত্রকুমারী ছিল, সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, মর্ম্মরপ্রস্তর-বিনিন্দিত প্রকোষ্ঠোপরি মর্ম্মর-প্রস্তর-বিনিন্দিত একটী সজীব মূর্ত্তি তাঁহারই আশায় দাঁড়াইয়া আছে। সেই মুহূর্ত্তে দুইটী হৃদয় একত্রিত হইল—হামির তাঁহার প্রাণাধিকা প্রিয়তমা পতি-ব্রতা ভার্য্যা ক্ষেত্রকুমারীর গোলাপ-পুষ্প-বিনিন্দিত গণ্ডে রুদ্ধশ্বাসে শত চুম্বন প্রদান করিলেন। এ চুম্বন কিসের ? রুদ্ধশ্বাসে এ শত চুম্বন কিসের জন্য ? ইহা কৃতজ্ঞতার ! এ চুম্বন পবিত্র কৃতজ্ঞ-তার জন্য। ক্ষেত্রকুমারী স্বামীর জন্য, চিতোরের নিপীড়িত প্রজাপুঞ্জের জন্য যাহা করিয়াছিল, ইহা তাহারই প্রতিদান। পতিব্রতা, পরদুঃখকাতরা ক্ষেত্রকুমারীর পক্ষে ইহাই কি যথেষ্ট ?—না, তাহা

নহে। হামির, যাবজ্জীবন তাঁহার নিঃস্বার্থ প্রেম-অঞ্জলি দ্বারা ক্ষেত্রকুমারীকে পূজা করিবেন, চিতোরের নিপীড়িত প্রজাপুঞ্জ চিরদিন তাহা-দিগের কৃতজ্ঞতার পবিত্র অশ্রুজল দ্বারা ক্ষেত্র-কুমারীর পদযুগল ধৌত করিবে—তবে ক্ষেত্র-কুমারীর উপকারের প্রতিশোধ হইবে।

আজ্ চিতোর-দুর্গে বাপ্পারাওলের চিহ্নিত চিতোরের পবিত্র পতাকা উড্ডীয়মান হইতেছে। সমীরণ-হিল্লোলে নাচিয়া নাচিয়া পতাকা, চিতো-রের সুখ-স্বাধীনতার কথা সুদূর দূরে জানাইয়া দিতেছে। চিতোরনগরী আজ বিধবার বিষাদ-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া সধবার মনোমোহন বেশ ধারণ করিয়াছে! চিতোরের প্রত্যেক নরনারীর আস্যে আজ প্রফুল্লতা বিরাজ করি-তেছে। প্রতি গৃহে মঙ্গলঘট স্থাপিত হই-য়াছে, এবং প্রতি অট্টালিকাচূড়ে মঙ্গল-পতাকা উড়িতেছে। চিতোর আজ স্বাধীন! চিতোরের

নরনারী আজ পরাধীনতার কঠোর শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত।

মালদেব, মীরদিগকে পরাস্ত করিয়া অতি-দর্পভরে চিতোরে ফিরিলেন। চিতোর-তোরণ-দ্বারে উপনীত হইবামাত্র তিনি সকল ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া শিরে করাঘাত করিতে লাগিলেন। আজ মালদেবের সুখনিশা প্রভাত হইয়াছে। চিতোর-শাসন-দণ্ড ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছে। স্বদেশবৎসল বীরবর হামির, মাল-দেবকে অভ্য-র্থনা করিবার জন্য কতিপয় প্রধান সর্দ্দারকে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু মালদেব, ঘৃণার সহিত সে আহ্বান অগ্রাহ্য করিলেন। মোগল-সেবক মালদেব আর কাল গৌণ করিলেন না, অবিলম্বে মোগল-সাহায্য গ্রহণ করিতে দিল্লী-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় চিতোরবাসিগণ পটকা ছুড়িয়া তাহাদের পূর্ব্ব শাসনকর্ত্তাকে বিদায় দিল।

পরিশিষ্ট।

হতভাগ্য মালদেব, হামিরের বিনীত আহ্বান অগ্রাহ্য করিলেন। অবিলম্বে দিল্লীর বাদসাহ মহম্মদ খিল্‌জির নিকট যাইয়া সকল বৃত্তান্ত বলিয়া তাঁহার কৃপা প্রার্থনা করিলেন। যবন-সম্রাট্ এই বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অতিশয় উত্তেজিত হইলেন; অবিলম্বে হামিরের বিরুদ্ধে এক বিশাল সেনাদল সজ্জিত করিতে আদেশ করিলেন। অবিলম্বে আদেশ পালিত হইল, এবং মহম্মদ খিল্‌জি স্বয়ং সেনাপতির পদ গ্রহণ করিয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কুক্ষণে সম্রাট্, হামিরের ন্যায় প্রচণ্ড বীরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। শিঙ্গোলী নামক স্থানে উভয়পক্ষে সাক্ষাৎ হইল। অতি অল্পকালের মধ্যে বীরবর হামিরের প্রচণ্ড অসির প্রচণ্ড আঘাতে

মোগলকুল দলিত ও নিষ্পেষিত হইয়া গেল। কেবলমাত্র ইহাই নহে, দিল্লীসম্রাট, হামিরের হস্তে বন্দী হইলেন। মালদেবের সকল আশা ভরসা এই খানেই বিনাশ পাইল। হামির, সম্রাট্‌কে বন্দিস্বরূপ চিতোর লইয়া গেলেন; কিছুদিন সেখানে রাখিয়া প্রকৃত বীরের ন্যায় তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন। মুক্তি দিবার সময় বলিয়া দিলেন,—

"যবন-সম্রাট্‌! তোমাকে ভয় করিয়া আমি তোমাকে মুক্তি দিতেছি না—তোমার যাহা শাস্তি হইয়াছে, আমার বিবেচনায় ইহাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট। যাও, এখন গৃহে ফিরিয়া যাও, যদি ক্ষমতা থাকে, চিতোর দখল করিও। হামিরের কোষোম্মুক্ত তরবারী সর্ব্বদা তোমার অপেক্ষা করিবে।"

অবশেষে মালদেব-পরিবার হামিরের বশ্যতা স্বীকার করিল। মালদেব নিজে আর চিতোরে আইসেন নাই। বীরবর হামির, তাঁহার শ্বশুরকুলের

প্রতিপালনের নিমিত্ত মূল্যবান্ জায়গীর সকল প্রদান করিলেন, এবং তাহাদিগকে ধীরভাবে বুঝাইয়া দিলেন, চিতোর মালদেবের রাজ্য নহে, তাঁহারই রাজ্য।

সমাপ্ত।